আহমদ ছফার
ডায়েরি

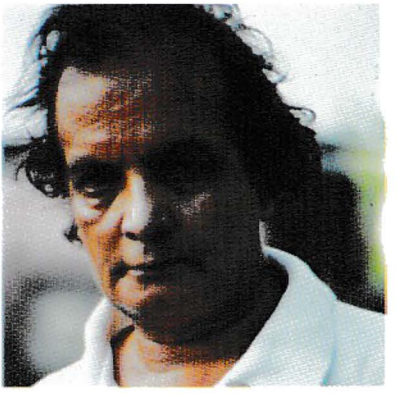

আহমদ ছফা : জন্ম ৩০শে জুন, ১৯৪৩, চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানার গাছবাড়িয়া গ্রামে। বাবা মরহুম হেদায়েত আলি, মা মরহুমা আসিয়া খাতুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ এবং গবেষক, বাংলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় রেখেছেন প্রতিভার স্বাক্ষর। কবিতা, গান, ছোটগল্প, উপন্যাস, শিশু-সাহিত্য, প্রবন্ধ, অনুবাদ, ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনী মিলিয়ে বহু গ্রন্থের প্রণেতা। জার্মান মহাকবি গ্যোতের অমরসৃষ্টি 'ফাউস্ট' অনুবাদ করে বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধিকরণসহ 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস', 'বাঙালি মুসলমানের মন', 'যদ্যপি আমার গুরু', 'পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ'-এর মতো বহু সৃজনশীল গ্রন্থের স্রষ্টা। অধুনালুপ্ত দৈনিক গণকণ্ঠের সম্পাদকীয় উপদেষ্টা এবং সম্পাদক, সাপ্তাহিক উত্তরণ ও ত্রৈমাসিক উত্থানপর্ব। বাংলাদেশ লেখক শিবিরের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সভাপতি। বস্তির শিশুদের বিদ্যাপীঠ সুলতান-ছফা পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বেশ কিছু রচনা বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার, সাদ'ত আলী আকন্দ পুরস্কার (প্রত্যাখান), লেখক শিবির পুরস্কার (প্রত্যাখান) এবং মরণোত্তর একুশে পদক লাভ করেন। ২০০১ সালের ২৮শে জুলাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নূরুল আনোয়ার : বাবা মরহুম আবদুল ছবি, মা মরহুমা জোবাইদা খাতুন। ইতিহাসে এমএ এবং সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত। বর্তমানে পিপিআরসি নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। আহমদ ছফার ভ্রাতুষ্পুত্র।

সাহিত্যে আহমদ ছফার প্রতিভা সর্বজনবিদিত। তিনি যা লিখতেন এবং বলতেন তা ছিল পাঠকদের অন্তস্থলকে চমকে দেয়ার মতো, যে কারণে তিনি অন্য দশজন লেখকের মতো নন। লিখতে গিয়ে তিনি কখনো সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সরে দাঁড়াননি। লক্ষ্য করার বিষয়, তিনি ডায়েরি লিখতে গিয়েও তার ব্যতিক্রম ঘটাননি। সবরকম লেখায় যে তিনি সিদ্ধহস্ত ডায়েরির পাতাগুলো তার জলন্ত প্রমাণ। কেবল দৈনন্দিন কাজের ফিরিস্তি দিয়ে তিনি থেমে থাকেননি, তার মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন তাঁর চিন্তা-চেতনার উৎকৃষ্ট ভাবনাগুলো। সম্ভবত জাতলেখকেরা এমনই হন। বর্তমান প্রকাশনাটি ডায়েরি হলেও এটি আহমদ ছফার সাহিত্যে আরেকটি মাইলফলকের কাজ করবে তা হলফ করে বলা যায়। আশাকরি আহমদ ছফার অন্যসব বইয়ের মতো এটিও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

আহমদ ছফার ডায়েরি

সম্পাদনা

নূরুল আনোয়ার

খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি
৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ISBN 984-408-091-6

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০০৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ
জুলাই ২০১৩

কে এম ফিরোজ খান, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি
৯ বাংলাবাজার (২য় তলা) ঢাকা ১১০০ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
মৌমিতা প্রেস ২৫ প্যারীদাস রোড ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত।

বর্ণবিন্যাস
আবির কম্পিউটার

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

মূল্য : ১২৫.০০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

ছিন্নমূল শিশু

সুলতান-ছফা পাঠশালা

ভূমিকার পরিবর্তে

লেখা সম্পাদনা করা একটি দুরূহ কাজ; সেটা যদি হয় আমার মতো আনাড়ি লোকের দ্বারা তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু কোনো দায়িত্ব যদি আপনাআপনি কাঁধে এসে ভর করে তখন পালিয়ে বেড়ানোর আর উপায় থাকে না—আমার দশা হয়েছে অনেকটা সে-রকম।

আহমদ ছফাকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার কোনো দরকার পড়ে না। তিনি গত হয়েছেন এখনো তিন বছর অতিক্রান্ত হয়নি। গত বছর তাঁর কিছু অপ্রকাশিত লেখা নিয়ে আমার সম্পাদনায় মাওলা ব্রাদার্স থেকে একটি প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছিলো, তারই ধারাবাহিকতায় এবার খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি থেকে 'আহমদ ছফার ডায়েরি' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো। ডায়েরিটি প্রকাশের উদ্যোগ নিতে যেয়ে আমাকে নানাজনের মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কেউ কেউ বললেন, আহমদ ছফা মারা গেছেন এখনো মানুষের মন থেকে শোকের ছায়া মুছে যায়নি। আরো কিছুদিন যাক। এতো তাড়াহুড়ো করে ডায়েরি প্রকাশের কোনো দরকার নেই। তাছাড়া ডায়েরি ব্যক্তির নিতান্ত গোপনীয় জিনিষ, সেটা গোপনই থাকুক। কেউ কেউ বললেন, আহমদ ছফা ছিলেন ঠোঁটকাটা মানুষ। তিনি কখনো কোনো কিছু গোপন রাখতেন না। তিনি যা দেখতেন এবং ভাবতেন লোকসমক্ষে তা অকপটে প্রকাশ করে যেতেন। সুতরাং ডায়েরিতে যদি উৎকৃষ্ট কিছু থেকে থাকে তা প্রকাশ করে ফেলাই ভালো। কথাটা আমার মনে ধরলো। তাছাড়া আরো একটি কারণ ছিলো, ডায়েরির পাতাগুলো একরকম নষ্ট হতে চলেছে এবং লেখাগুলো এতো ঝাপসা হয়ে আসছে যে, আর কিছুকাল পড়ে থাকলে উদ্ধার করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। সে-সব কথা রইলো।

আহমদ ছফা কোনো কাজে একনাগাড়ে লেগে থাকতেন না। যখন যেটা তাঁর মনে ধরতো তখনই তিনি লেগে যেতেন। খানেক এটা, খানেক ওটা– যে কারণে তিনি খুব কমই কাজের শেষটা দেখতে পেতেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি, সমাজ-রাজনীতি, সভা-সংগঠন কোন্‌টার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন না? যদি একটার পেছনে আজীবন লেগে থাকতেন হয়তো তাঁর ইতিহাসটা অন্যরকম হতে পারতো। তাঁর ডায়েরি লেখার ব্যাপারেও সে জিনিষটি লক্ষ্য করা গেছে। তিনি একনাগাড়ে লেখাগুলো লিখেননি। তিনি প্রথম ডায়েরি লেখা আরম্ভ করেন ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর সময়ে দেশে ফেরার পর। মাত্র ক'দিন লিখে তিনি কলম বন্ধ রাখেন। এ ক'দিন তিনি কেবল দৈনন্দিন কাজের ফিরিস্তিই দিয়েছেন। তারপর ১৯৭৩ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সময়ে দফায় দফায় ডায়েরি লেখার চেষ্টা করেছেন। এ সময়কার লেখাগুলোর মধ্যে তাঁর জীবন, সাহিত্য, রাজনীতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার দূরদর্শিতা এতো বেশি প্রজ্বলিত হয়ে

ওঠেছে নেহায়েত তা ডায়েরি বলে মনে হয় না। মহাকবি গ্যয়টের ডায়েরি পড়তে গিয়ে তিনি এক রকম ধাক্কা খান এবং ডায়েরি লিখতে প্রবৃত্ত হন, যে কারণে ডায়েরির পাতাগুলো দৈনন্দিন কাজের ফিরিস্তি না হয়ে একেকটি হয়ে উঠেছে সাহিত্যের অংশ।

বইটি সম্পাদনা করতে গিয়ে আমাকে দু'টি বিষয়ে নজর দিতে হয়েছে—এক. লেখকের লেখাকে কোনো রকম বিকৃত না করে যথাযথভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা; দুই. ঘটনা-পরিক্রমা ঠিক রাখার জন্য লেখাগুলোকে তারিখ অনুসারে সাজিয়ে নেয়া। আশা করি, দু'টি কাজই আমি যথাযথভাবে করতে সক্ষম হয়েছি।

বইটি প্রকাশে যিনি আমাকে সহযোগিতা এবং সমর্থন যুগিয়েছেন তিনি ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। তিনি প্রেরণা না যোগালে হয়তো এই বই সম্পাদনায় এগিয়ে আসতে পারতাম না। তাঁকে আমার অভিনন্দন। যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ—ড. চিন্ময় হাওলাদার, ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ মাহবুবুল করিম, খন্দকার সাখাওয়াত আলী, মাহমুদ টোকন, হোসেন আফরোজ আরা শিল্পী আবদুল্লাহ্ আল রাশেদ। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। পরিশেষে যাঁর কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানির নির্বাহী পরিচালক কে. এম. ফিরোজ খান। তিনি এগিয়ে না এলে এই বই প্রকাশে আরো বিলম্ব ঘটতো। তাঁকে ধন্যবাদের খাতিরে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করতে চাই না।

আবারো বলছি, বই সম্পাদনা করার মতো যোগ্যতা আমার নেই। তারপরেও একটি কঠিন কাজ আমাকে করতে হলো। আমার ভুল-ত্রুটি সকলে ক্ষমার চোখে দেখবেন এটাই প্রত্যাশা করি।

নূরুল আনোয়ার
ফেব্রুয়ারি, ২০০৪
পিপিআরসি

৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পহেলা বোশেখ অর্থাৎ বাংলা বছরের পয়লা তারিখ আগরতলা এসেছিলাম। গতকাল ডিসেম্বর মাসের ৩০ তারিখ। দেশের দিকে যাচ্ছি। কোলকাতা এসেছিলাম সহায়হীন, সম্বলহীন, বন্ধুহীন। চলে যাবার সময় ঢাকার মতো কোলকাতাকেও আপন মনে হচ্ছে। সুনন্দা, অর্চনা, সুনীলদা, মযহার ভাই সকলের স্মৃতি বড়ো মধুময়। প্লেন ছাড়তে দেরি হলো। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে দেড় ঘন্টায় আগরতলা এলাম। আগরতলায় বন্ধুরা স্বাগত জানালেন। বিজনদাদের বাসায় যেয়ে বিকচের সঙ্গে ঘুমোলাম।

১ জানুয়ারি, ১৯৭২

নতুন বছরকে স্বাগতম। পেছনে রক্তের দগদগে স্মৃতি। আগরতলাতে নতুন বছর বেয়ারাভাবে এসেছে। কমলের বাসায় গিয়ে দেখা পেলাম না। রণেশদাদের বাসায় গেলাম। বই উপহার দিলাম। নীরা এবং জবাকে নিয়ে নিভার বাসায় গেলাম। সুখময়দার বাসায় খেলাম।

২ জানুয়ারি, ১৯৭২

আজ সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে কমলের ওখানে গেলাম। শুয়ে পড়লাম। ওঠে খেলাম। বিকেলে সংবাদে গেলাম। রাতে কার্তিকদার বাসায় খেলাম। ধীরা শার্ট উপহার দিলো।

৩ জানুয়ারি, ১৯৭২

আজ কমলকে নিয়ে পথ দিলাম। আগরতলার সীমানা ছাড়লাম। হেঁটে হেঁটে সুলতানপুরে এসে রিকশা ধরলাম। ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাম। পলাশবাড়িতে জিনিষপত্তর রেখে বাড়িতে টেলিগ্রাম করলাম। সিরাজকে খুঁজে পেলাম। ড. আমিনের সঙ্গে কথা হলো। আলাপ করলাম। খালার বাসায় এসে খেয়ে ঘুমোলাম। ক্লান্তির ঘুম। সঙ্গে কমল। রিকশাওয়ালা ঠিক করলাম। রাত সাড়ে চারটের সময় সে এসে আমাদের জাগালো। আমরা গোকর্ণ লঞ্চঘাটের দিকে যাত্রা করলাম।

৪ জানুয়ারি, ১৯৭২

আজ সকাল ছ'টায় গোকর্ণ ঘাট থেকে লঞ্চ ছাড়লো। মানিকপুর ঘাটে যাত্রির ভারে লঞ্চ ডুবার উপক্রম। যাহোক, নরসিংদী এলাম। সেখানে খেলাম। নরসিংদী থেকে বাসে এলাম পাঁচ-সুকি। অনেকগুলো সেতু বিধ্বস্ত। পাঁচ-সুকি থেকে এলাম। আবার বাসে তারাব বাজার। ঘাটে ভারতীয় সেনা কিলবিল করছে। শীতলক্ষ্যা নৌকাযোগে পেরিয়ে বেবীট্যাক্সিতে এলাম টিকাটুলী। নওয়াবদের বাসায় এলাম। পেলাম না। দৈনিক পাকিস্তানে এলাম। শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, মাহফুজউল্লাহ, মোর্শেদ, আহমেদ

হুমায়ুনের সঙ্গে দেখা। মুজফ্‌ফর কাকুর দেয়া বই এখলাসউদ্দিন সাহেব নিলেন। শরীফ স্যারের বাসায় এলাম। হাসান গ্রীনরোডে নিয়ে এলো। নুরুল হুদাকে পেলাম।

৫ জানুয়ারি, ১৯৭২

আজ সকালে ঘুম ভাঙলো আগে। শেভ এবং স্নান করলাম। টিফিন সেরে কমল, হাসান, হুদাসহ শাহনূরের বাসায় গেলাম। সায়ীদ ভাইয়ের বাসায় গেলাম। হাসানসহ উয়ারীতে নওয়াবের বাড়ি গেলাম। নওয়াবসহ বাংলা একাডেমীতে এলাম। কবীর স্যারের সঙ্গে কথা হলো। ফরহাদ, হেলাল, হুদা, হুমায়ুন এবং নওয়াবসহ আলোচনায় বসলাম। আকরাম এলেন। স্টেডিয়ামে খেয়ে দৈনিক বাংলায় (পাকিস্তানে) গেলাম। হাসান সাহেব এবং শামসুর রাহমান সাহেবের সঙ্গে আলাচনায় বিশেষ সুবিধে করতে পারলাম না। বাংলাবাজারে এসে হতবাক হয়ে গেলাম। এখনো সব প্রেতপুরী। এসে শরীফ সাহেবের বাসায় খেলাম। অনেকক্ষণ আড্ডা মারলাম। বলতে গেলে দিনটা বাজে খরচ করলাম।

৬ জানুয়ারি, ১৯৭২

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে কমলকে ডেমরা অবধি দিয়ে এলাম। বাংলা একাডেমীতে এলাম। কবীর স্যার শিবিরের তিনটি বইয়ের ব্যয়ভার গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলেন। বোরহান স্যারের সঙ্গে দেখা হলো। হুমায়ুন, হুদা, ফরহাদ, হেলাল, শাহনূরের সঙ্গে বসলাম। ডঃ মনিরুজ্জামান সাহেব এবং আকরাম হোসেনের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। আগামী সোমবারে সভা। হুমায়ুনের বাসায় খেতে গেলাম। খেয়ে ফরহাদ মজহারের বাসায় এলাম। একটু অসাবধানে কথাবার্তা বললাম। ফরহাদ সম্বন্ধে এখনো একটা স্থির ফয়সালায় আসতে পারিনি। স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স থেকে ধারে 'The age of Adventure' বইটা কিনলাম। সুনন্দা, মুজফ্‌ফর কাকু এবং ইসলাম সাহেবকে চিঠি লিখলাম।

৭ জানুয়ারি, ১৯৭২

আজ ঘুম থেকে উঠেই হাসানসহ ইন্দিরা রোডে শেরীফা নীড়ে গেলাম। চৌধুরী সাহেব ফিরেননি। বাড়িটা জঙ্গল হয়ে গেছে। উয়ারীতে নওয়াবদের বাসায় গেলাম। পেলাম না। জিন্নাহ এ্যাভিনিউতে দেখা। কোলকাতায় চিঠিগুলো পোস্ট করলাম। নওয়াবসহ বাংলা একাডেমীতে এলাম। বদিউজ্জামান সাহেবের কাছে জামিনের নাম দাখিল করলাম। মিসেস হোসেনে আরার সঙ্গে দেখা হলো। বেবীর সঙ্গেও। শরীফ স্যারের বাসায় গেলাম। কিছুক্ষণ কথা হলো। তারপর চলে এলাম। হুমায়ুনসহ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সাহেবের ধানমণ্ডির বাসায় এলাম। তারপর সায়ীদ সাহেবের বাসায়। হুমায়ুন কবীর চলে গেলেন। ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে এলাম। ধীরার দেয়া শার্টটা নিলাম। নুরুল হুদা ড. শাহনূরের সঙ্গে চলে এলাম নতুন বাসায়।

৮ জানুয়ারি, ১৯৭২

সকালে ঘুম থেকে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। রফিক সাহেব ও মুহম্মদ মনিরুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে দেখা। তারপরে বাংলা একাডেমী। অর্থহীন কচকচি—অনেক সময় নষ্ট। নওয়াবসহ তোপখানা। তারপরে নওয়াবদের বাড়িতে যেয়ে খেলাম। আসার পথে নারিন্দার বাসা— কেউ নেই। এলাম আবার বাসায়। তারপর শরীফ সাহেবের বাসায় গেলাম। গল্পগাছা হলো ব্যক্তিগত। তারপর বাসায়। অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছি। এ বাসায় বোধ হয় থাকা হবে না। শেখ সাহেবের মুক্তি সংবাদ শুনলাম। অর্চনা স্মৃতিতে জ্বালাতন করছেন।

১০ জানুয়ারি, ১৯৭২

দেরিতে ঘুম ভাঙলো। চা, নাস্তা খেয়ে এসে 'The age of Adventure' পড়তে চেষ্টা করলাম। মন বসলো না। স্নান করে বোরহান স্যারের বাসায় গেলাম। হুমায়ুনের আলোচনার ধরন দেখে পিত্তি জ্বলে গেলো। মামুন, হুমায়ুনসহ বের হলাম। ওরা খানিকক্ষণ গল্প করে চলে গেলো। তারপরে ঘুমোলাম। অনেকক্ষণ। ঘুম ভাঙার পরেও অনেকক্ষণ শুয়ে রইলাম। মনে হচ্ছে এতো রক্তপাত আমাদের লেখকদের চরিত্রের কোনো মৌলিক পরিবর্তন করতে পারেনি। মানুষগুলোকে স্থূল এবং প্রাগৈতিহাসিক মনে হচ্ছে। মিসেস হোসনে আরার বাসাতে যাচ্ছিলাম। নুরুল হুদা আর শাহনূর ফিরিয়ে আনলো। এখন পড়ছি 'Reason, Romanticism, Revolution.'

১১ জানুয়ারি, ১৯৭২

আজ সকালে ঘুম থেকে জেগে শরীফ স্যারের বাসায় এলাম। তরফদার স্যারের সঙ্গে দেখা করলাম। স্যারের কাছ থেকে একশো টাকা ধার করলাম। দৈনিক বাংলায় গেলাম। হাসান সাহেব এবং শামসুর রাহমান সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। হুমায়ুন এবং ফরহাদসহ খেলাম। দু'জনকে নিয়ে রেসকোর্সে এলাম। ওদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়লাম। শেখ সাহেবের বক্তৃতা শুনলাম। লিঙ্কনের গেটিসবার্গের বক্তৃতার কথা মনে পড়ে। ফজলুসহ তার বাসায় এলাম। ফরিদার মাতৃমূর্তি পুজো করার মতো। লেখক সংঘের অফিস খুঁজে পেলাম না। নিউ মার্কেটে এসে বালতি, জগ, মগ, গ্লাস, হারিকেন, ড্রাম, ডিম এবং বাতি কিনলাম। শিবিরের একখানা দরখাস্ত লিখলাম। আমার বিয়ে করার কথাটি সকলে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

১২ জানুয়ারি, ১৯৭২

আজ সকালে জেগে মনে হলো শেফালী সেনগুপ্তাকে স্বপ্নে দেখেছি। নয়াপল্টন যেয়ে বি. রহমানকে ধরলাম। তিনি বাদলদের চোর বললেন, আর নিজের বিষয়ে কি ভাবলেন জানিনে। ডঃ এনামুল হক স্যারের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি পুত্রবত স্নেহে আমায় নিলেন। আজ বাংলা একাডেমীর সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলাম। শরীফ স্যার আর

বোরহান স্যার আমার জামিন হলেন। কবির স্যার বই তিনটি প্রকাশ করতে স্বীকৃত হলেন। হুমায়ুন, ফরহাদ, হুদা, শাহনূর এবং মামুনকে নিয়ে আলোচনায় বসলাম। কিছুই স্থির হলো না। স্টেডিয়ামে যেয়ে কাপড় কিনলাম। হোটেলে খেয়ে বাসায় এলাম। তারপর বিশ্রাম শেষে যেয়ে তক্তপোষ, টেবিল নিয়ে এলাম। ইন্দিরা রোডে যেয়ে চৌধুরী সাহেবকে পেলাম না।

১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২

সকালে ইন্দিরা রোডে যাওয়া হলো। চৌধুরী সাহেব নেই। তারপর স্নান অন্তে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড। হক সাহেব নেই। বাংলা একাডেমী, বাংলা বিভাগ। ব্যাংকে যেয়ে চেক ভাঙালাম। বাজার করলাম। চৌধুরী সাহেবকে পেলাম না। স্টেডিয়ামে যেয়ে খেলাম। বাড়িতে ২৫০.০০ টাকা Express Telegram-এ পাঠালাম। জামাল এবং সিরাজকে লিখলাম চিঠি। রেজিস্টার্ড। তারপর ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে এসে ঘুমোলাম। ঘুম থেকে জেগে শরীফ স্যারের ওখানে গেলাম। টাকাটা ফেরত দিলাম। তারপর হুমায়ুনের বাসা। অনেক রাতে ফিরে এলাম। ভুলে গেছি সেদিন দুপুরে শাহনূরকে ৫০.০০ টাকা দিয়েছি।

১৪ জানুয়ারি, ১৯৭২

আজ নিদ্রান্তে উয়ারীতে নওয়াবদের বাসায় যেয়ে বইপত্র এবং চিঠিপত্র নিয়ে এলাম। বাংলা একাডেমীতে মাহবুবউল্লাহ্‌র সঙ্গে দেখা হলো। নিশ্চয়ই আনন্দের। খুব তাড়াতাড়ি চলে এলাম। হোটেলে খেয়ে একটু গোছগাছ করে রাখলাম। প্যান্টের ট্রায়াল দিয়ে এসে ঘুমোলাম। জেগে M. N. Roy শেষ করলাম। P. C. Roy-এর জীবনী পড়তে ধরলাম। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো। নিউ মার্কেটে গেলাম। অতর্কিতে গীতশ্রীর সঙ্গে দেখা হলো। মেয়েটি এখনো ভালোবাসে আমাকে। শরীফ স্যারের বাসায় গেলাম। ডঃ হিরন্ময় সেনগুপ্তকে লেখার অনুরোধ করলাম।

১৫ জানুয়ারি, ১৯৭২

শামসুর রাহমান সাহেবের বাড়িতে যাওয়া হলো। পথে বানুদের বাসা। পিনাকীসহ সেখান থেকে বাংলা একাডেমী। লজ্জার কথা, তবু বাংলা একাডেমীতে একটা ফাঁকা প্রতিবেদন দাখিল করলাম। ছেলেদের সঙ্গে বসলাম। টেলিগ্রাফ অফিসে যেয়ে ড. অজয় রায়ের কাছে শরীফ স্যারের হয়ে টেলিগ্রাম করলাম। একটু পড়লাম। তারপর বাসা। প্যান্ট নিলাম দরজির কাছ থেকে। তারপর ঘুমোলাম। উঠে আচার্য পি. সি. রায়ের জীবনী পড়লাম। তারপর বাংলা একাডেমীতে মুলকরাজ আনন্দের সভায় গেলাম। লোকটিকে ভালো লাগলো না। নওয়াবের সঙ্গে জিপিও পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। তারপর চলে এলাম।

১৭ জানুয়ারি, ১৯৭২

আজ সকালে ঘুম থেকে একটু আয়েশ করেই জাগলাম। নাস্তা খেয়ে পি. সি. রায়ের আত্মজীবনী পড়লাম কিছুদূর। তারপর নিউ মার্কেটের দিকে। পথে আকরামের সঙ্গে দেখা। এসে কাপড়-চোপড় ধুয়ে দিলাম। খেয়ে ঘুমোলাম। ঘুম থেকে উঠে আবার সে পি. সি. রায়ের আত্মজীবনী। সন্ধ্যের দিকে মিসেস হোসনে আরার বাড়ি। তারপর ড. হিরন্ময় সেনগুপ্ত এবং শরীফ স্যার। বাসায় এসে দেখি ঝগড়া। আবুল হাসান আর হুদার। রাতটা নষ্ট হয়ে গেলো। দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো।

১৮ জানুয়ারি, ১৯৭২

আজ দিনভর ভয়ঙ্কর ক্লান্তি। সকালে উঠে ইকবাল হলে জিনাত আলীর খোঁজে গেলাম। নেই। তারপর বাংলা একাডেমী। মামুনসহ বাংলাবাজার। কালি-কলম, মাওলা, প্রকাশ ভবন, খান ব্রাদার্স, হেরাল্ড—তারপর বাসা। খেয়ে শুয়ে পড়লাম। আধশোয়া অবস্থাতে এলো নওশাদ, কায়সার। কিছুক্ষণ বসলো ওরা। মনটা ভারী বিষিয়ে গেলো। বুকটা ভারী খা খা করছে। আচার্য রায় পড়লাম বেশ কিছুদূর। বেরুলাম। নিউ মার্কেটে সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা। আশ্চর্য একটি কবিতা পড়লাম। তারপরে নিয়ামত হোসেন সাহেবের বাসা।

১৯ জানুয়ারি, ১৯৭২

আজ সকালে একটু রুটিন পাল্টালাম। দেরিতে টিফিন করলাম। তারপর বাংলা একাডেমী। নওয়াবের সঙ্গে দেখা। মি. সে. হো. আমার প্রতি গাঢ় অনুরাগ দেখালেন। কবীর স্যারের সঙ্গে গোলাম রহমানের ব্যাপারে আলোচনা করতে। তারপর বাংলা বিভাগ, ইংরেজি বিভাগ। ফরহাদ মজহারের বাসা। সে পুরোনো কাসুন্দী, ক্লান্ত-শ্রান্ত প্রত্যাবর্তন। নিদ্রা। ওঠে রাসেলের 'What I believe' পড়লাম। নিউ মার্কেট যেয়ে নওরোজকে গোলাম রহমানের খবরটা দিতে বললাম। আজ লিখবোই।

৩ মার্চ, ১৯৭৩

সকালবেলা এই দিনলিপিখানি পেলাম। আমার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। মানুষের ছোটো ছোটো সাধগুলো পুরোলেই সবচেয়ে খুশী হয়। স্বপ্ন আমার কাছে রহস্যই থেকে গেলো। অনেকবার স্বপ্নে যেমন দেখেছি, অবিকল তেমনটি ঘটেছে। আজও তাই হলো। নাস্তা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে অনেকবার মনে করতে চেয়েছি। রাতের স্বপ্নটা যেনো কি, যেনো কি। হুমায়ুনের বাবার সঙ্গে রেবুর বাসায় যাওয়ার সময় রিকশা থেকে সস্ত্রীক আসাদ ভাইয়ের ডাক শুনে মনে পড়লো, রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি আসাদ ভাইয়ের শ্বশুর মারা গেছেন, কবর দেয়ার টাকা পয়সা নেই। সে যাক, আসাদ

ভাইয়ের বৌটিকে এক ঝলক মাত্র দেখলাম।

হুমায়ুনের বাবা আজ অর্ধেক টাকা পেলেন। তিনি আমাকে পুত্রবত মনে করছেন। অন্যান্যরাও যদি সেরকম মনে করে বসে তাহলে তো সর্বনাশ। অথচ আমার মনে হচ্ছে সকলে যেনো কি একটা আঁচ করছে। আমি নিজেও কি ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে উঠিনি? আপাতদৃষ্টিতে পাগলেরাই অনেক বেশি তীক্ষ্নদৃষ্টির অধিকারী। বাংলা একাডেমী যাওয়ার পথে মাসুদ যা বললো সে কি আমার মনের কথা নয়? আমার মন বলতে কিছু আছে কি? আমাকে মেয়েরা খেলাচ্ছে। না আমি মেয়েদের নিয়ে খেলছি? এটা আমার শক্তি না দুর্বলতার পরিচয়? মনে মনে আমি খুবই অসহায় হয়ে পড়েছি। কোনো কাজ-কর্মে উৎসাহ পাচ্ছিনে। কোথায় কি যেনো হারিয়ে ফেলেছি। শামীমের কথা দুয়েকবার মনে করতে চেষ্টা করেছি। আমার সে তীব্রতা যেনো আর নেই। আমার চাইতে যারা ছোটো, তাদের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাতে শুরু করেছি। আমি একটা মানসিক ভারসাম্য নিজের মধ্যে আবিষ্কার করার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। বুদ্ধ সম্বন্ধীয় সংবাদ আমার মনকে কি উন্নত করতে সক্ষম হচ্ছে? আমি কাজে-কর্মে, চিন্তা-ভাবনায় যে স্নিগ্ধ আবেগ প্রত্যাশা করি, তার নাগাল পাচ্ছিনে। সবকিছু শুষ্ক মনে হচ্ছে। ডিপার্টমেন্টে চাকুরিটা প্রয়োজন। অনেক রকম ঝামেলা আছে। একটা উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। আমি সৃষ্টিশীল জীবন কামনা করেছি। মনে হচ্ছে তা কোনোদিন পাবো না। পরিবারের প্রতি কর্তব্যবোধ মনকে নাড়া দিচ্ছে। আমি যদি পূর্ণ দু'জন মানুষ হতে পারতাম, অথবা বুদ্ধ, নেপোলিয়নের মতো যথার্থ অর্থে একজন মানুষ হতাম, বোধহয় সব সমস্যার সমাধান করতে পারতাম। পারতাম সকল সাধ পূরণ করতে। আমার এই অস্থিরতার মূলে কি একটা নারীর সঙ্গ কামনা? নাকি আরো কিছু? যখন বিয়ে-শাদী করবো, তখন কি এই অস্থিরতা থাকবে না? বিয়ে করা মানুষগুলো দেখে সন্তুষ্ট হতে পারিনে। এরা সকলেই যেনো জীবনের কাছে মস্ত অপরাধ করেছে। ক্ষীণভাবে তারা সকলেই নিজেদের কাছে লজ্জিত। যা হতে চেয়েছে, না পেরে অন্য কিছু হয়ে গেছে। এই পরিণতি তো আমার জন্যেও অপেক্ষা করে রয়েছে। যে সকল মানুষকে ভালোবেসেছি, যেমন রবীন্দ্রনাথ, রাসেল, গ্যয়টে তাঁদের মতো আমি কি হতে পারবো? কোনো কোনো সময় নিজেকে ভাবি অসাধারণ আর কোনো সময় নিজের অস্তিত্বটাই বিরক্তিকর জিনিষ হয়ে দাঁড়ায়। লালন ফকিরের ভাষায়,

সুখ পেলে হয় সুখ উতলা

দুঃখ পেলে হয় দুঃখ ভোলা ...

ভারী আজব জিনিষ জীবন—এই জীবনে কি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু আছে, না থাকতে পারে?

[illegible]

৩রা মার্চ, ১৯৭৩

[illegible]

[redacted] [illegible]

[illegible]

দায়িত্বের সকল দাবি পূরণ করছে।
আমার এই অনুভূতি কি মানুষের চিন্তা-
নীতি সঞ্চার করবে ? [illegible]
মনে ? যখন যখন বসে আমি ভাবি, তখন
মনে এই অনুভব [illegible] জাগে ? কিসে
করে মানুষ মানুষের থেকে মানুষ হতে
পারছে। কিন্তু সকলেই [illegible]
জীবনের [illegible] সত্য [illegible]।
[illegible]
[illegible]। [illegible]
[illegible]। [illegible]
[illegible]
[illegible],
[illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible],
সুখ পেলে হয় সুখ [illegible]
দুঃখ পেলে হয় দুঃখ [illegible]—
[illegible]— [illegible]
[illegible]
[illegible]।

৪ মার্চ, ১৯৭৩

আমার নিজের শরীরের মধ্যেই আমি জীবন এবং মৃত্যুকে, অতীত এবং ভবিষ্যতকে স্বাধীনতা এবং দাসত্বের বন্ধন দেখতে পাচ্ছি। গতকাল অস্তিত্বকে বিরাট এক অস্থিরতা মনে হয়েছে। আজ অস্থিরতাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করছি। আসলে এই অস্থিরতাই জীবন। আমার মধ্যে একদিন এই অস্থিরতা থাকবে না হয়তো। সেদিনের কথা চিন্তা করলে ভয়ে নীল হয়ে যাই। স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারবো না, কল্পনা করবার শক্তি হারিয়ে ফেলবো। আজকের দিনে যাদের বিকৃত বুদ্ধিজীবী বলা হয়, আমি নিজেও কি তাদের একজন হয়ে যাবো না? Bertald Breett যা বলেছেন :

There is no remorseless reactionary than a frustrated innovator, no Gueller enemy of the wild elephant than the tame elephant.

সমস্ত শক্তি জড়ো করে সামনে যদি পথ না হাঁটি আমার দম বন্ধ হয়ে আসবে। আমি নিজের ভেতরেই পঁচে ওঠবো। সুযোগ, সুবিধে, লোভ কিছুর কাছেই নতি স্বীকার করতে পারবো না। নতি স্বীকার করা আর আমার মরে যাওয়া একই কথা। কাজ করার যে আনন্দ আমি কামনা করি, কাজের মধ্যেই আমাকে কামনা করতে হবে। আমি বাধামুক্ত স্বাধীন কামনার সন্তান। আমাকেও কিছু অবাধে কামনা করতে হবে, নইলে বাঁচবো না। করুণা ইত্যাদি প্রকাশ করা এবং ব্যথিতের ব্যথী সাজার কোনো মানেই হয় না। আমি মনে মনে যা বাইরে তাই-ই হতে চাই। মানুষ যখন নিজের উপর সুবিচার করতে পারে না, তখন এটা ওটা করে মানসিক ক্ষতি পূরণ করার চেষ্টা করে।

আমি জীবনের মুখোমুখী সাহসের সঙ্গে দাঁড়াবো। যে আমাকে প্রেরণা দিয়েছে সে প্রেরণাময়ীর কাছে যাবো। যে আমাকে গৃহপালিত মানুষে রূপান্তরিত করতে চায়, তার কাছে যাবো না। আমার বন্যতা, উদ্দামতা, অস্থিরতার যথাযথ ব্যাখ্যা করা উচিত। কি হতে চাই, কতোটুকু যোগ্যতা আছে, পরিবেশ কতোটুকু সুযোগ দেবে এবং পরিবেশকে কতোদূর ভাঙতে হবে সেটিই দেখার বিষয়।

আজ দুপুরে আবার স্বপ্ন দেখেছি। হরিণ, মন্ত্রী সুহরাব হোসেনের বাড়ি, পরে দেখলাম হরিণটি সুন্দর একটা লাল গাড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে। নীতীশ আজ সকালে চলে গেলো। ধীরে ধীরে আমি সচেতন হয়ে উঠছি।

৪ঠা মার্চ

তোমার চিঠির শরীরের মধ্যেই আমি জীবন এবং মৃত্যুকে, অতীত এবং ভবিষ্যৎকে সমগ্রতা এবং [illegible] দেখতে পাচ্ছি। [illegible] একটি নতুন উপলব্ধির মধ্যে হয়েছে। তোমার অনুভূতিকে বহুদৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করছি। আমাদের দুটি উপলব্ধিই নীরব। তোমার [illegible] এই উপলব্ধির [illegible]। [illegible] কথা [illegible] জন্যে নীরব হয়ে যাই। [illegible] বুঝতে পারবেন, [illegible] দেবেন। [illegible] হবে, আমি চিঠি কী [illegible] হয়ে যাচ্ছে Bertolt Brecht এর কথা:

~~yet these disappointed men~~ ~~may still~~ There is no remorseless reactionary than a frustrated innovator, no crueller enemy of the wild elephant than the tame elephant.

সমস্ত [illegible] যদি [illegible] তোমার [illegible] হয়ে তোমার। আমার চিঠির ভেতরেই পাই তোমার। সুন্দর, সুকীর্তি, [illegible] কাছেই [illegible] স্বীকার করতে পারবেন। [illegible] স্বীকার [illegible] তোমার [illegible]। [illegible] তোমাকে [illegible]

সত্যিই তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হবে। তোমাকে
[illegible] [illegible] [illegible] সুন্দর। তোমাকে
এই যুদ্ধ তোমাকে অনেক করতে হবে, তবে
[illegible]। [illegible] [illegible] প্রকাশ করে
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]
[illegible], [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]।

৫ই মার্চ, ১৯৭৩

গত রাতে যা লিখেছি, তোমার বিষয়ে তাতে কিছু এমন উপাদান থেকে যায় প্রচণ্ড দার্শনিক চরিত্রের দিকটিও [illegible] হয়েছে। তবু দুটির এক সঙ্গে কথা, যেহেতু কাজেই বিরাট একটা হয়ে গেল বোঝা। মানুষ কি এই দায়িত্ব এখন পারে? বুদ্ধের যে নির্বাণ, খ্রিস্টের যে মুক্তি, মুহম্মদের যে কাহিনী মানতে পারি, দান্তে, মুসা, দুদিকে মনে হয়, তাঁরা সবাই একই সঙ্গে এক এবং ব্যক্তিগত মানুষ। একদিকে তোমাকে ভেবে ভেবে উত্তীর্ণ হবে দেখাতে হবে। নিজের মতো একটা পরিবর্তন যদি না ঘটাতে পারি, তবে সবাইকে পরিবর্তিত হতে বলার কোনো অর্থ থাকে না। [illegible] এর ভাবমূর্তি [illegible] [illegible] [illegible] চরিত্রের উত্থিত হলো। সেজন্য একটা মনের ভাবমূর্তি প্রকাশ করি। মনে হচ্ছে জীবনের সাধকের মতো আমার একটা বস্তুগত দুর্ভাগ্য দেখে এগিয়ে চলেছি। আমি ইচ্ছে করলে হয়তো তাকে দিয়ে করে দেখতে পারি। কিন্তু ভয় হয়, কষ্ট ভয় হয়, আমার এমন হৃদয়মনটির হাত পাই যে তোমার মাধুর্যটি বিশদ করে বোঝে। আমি তোমাও মধুর তুলতে পারি। কিন্তু তাতে যে অভিমান সুধা এবং একটা উত্তাপ প্রাপ্ত হবে তা আমি তোমার সাথে সাথী হবো। কিন্তু আমাদের? এই যে মুক্তিতে একদিন ভেবে দেখলাম, মানুষের একটা মুক্ত-মনের দোষের মতো একটা কল্পনা, তার দুর্ভাগ্য [illegible] হৃদয় মাটি পর্যন্ত ছুঁইয়ে তুলতে পারলাম। আর সব আমাকে ভেবেছে, কিন্তু আমি এক

[illegible]

[illegible]

৫ মার্চ, ১৯৭৩

গতরাতে যা লিখেছি, আমার বিশ্বাস তাতে এমন কিছু উপাদান আছে যার প্রভাব আজকের দিনটিতেও ক্রিয়াশীল রয়েছে। তবু চিন্তা এবং কথা, কথায় ও কাজে বিরাট একটা হাঁ রয়ে গেলো। মানুষ কি এই পার্থক্য খুঁজতে পারে? বুদ্ধের যে ইতিহাস, খ্রীস্টের যে বর্ণনা, মুহম্মদের (স:) যে কাহিনী জানতে পারি, পড়ে, শুনে, দেখে মনে হয়, তাঁরা মন এবং মুখ এক করে ফেলেছিলেন। এটি আমাকে অন্তত চেষ্টা করে দেখতে হবে। নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন যদি না আনতে পারি, অন্য সবাইকে পরিবর্তিত হতে বলার কোনো অর্থই থাকে না। সকালবেলা যুব আওয়ামী লীগের শুদ্ধি অভিযানের ঘোষণা শুনে সারা শরীর শিউরে উঠেছিলো। হুমায়ুনও একই ধরনের অনুভূতি প্রকাশ করলো। মনে হচ্ছে যৌক্তিক পরিণতির মতো আরো একটি রক্তপাত দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে আসছে। আমি ইচ্ছে করলে হয়তো কাউকে বিয়ে করে ফেলতে পারি। কিন্তু ভয় হয়, বড়ো ভয় হয়, পাছে এমন মেয়ে মানুষের হাতে পড়ি যে, আমার জীবনটা বিষময় করে তোলে। জমাট প্রেমও জমিয়ে তুলতে পারি। কিন্তু তাতে যে পরিমাণ সূক্ষ্ম শ্রম এবং উদ্যম ব্যয়িত হবে তা করতে আমি সত্যি সত্যি অপারগ। জীবন কয়দিনের? এই যে পৃথিবীতে এতোদিন বেঁচে থাকলাম, মানুষের এতো স্নেহ, মমতা পেটুকের মতে ভোগ করলাম, তার কৃতজ্ঞতাটুকু তো কোনো সৃষ্টিকর্মে ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না। আর মা, ভাইয়ের ছেলেমেয়ে, ভাগ্নে-ভাগ্নী এবং গ্রামখানির জন্যইবা কি করলাম। আমার জীবন কি অরণ্যরোদনের মতো অকাজে ফুরিয়ে যাবে? আমি কি মানুষের খুব কাছাকাছি আসতে পারবো না? অতীতের মোহ এবং তামসিকতা আমার সমস্ত সৃষ্টিশক্তিকে চেপে রেখেছে। জীবনীশক্তি যেনো ঠিকমতো খেলে বেড়াতে পারছে না। তাই আমার ভেতরে ক্রমাগত উল্লম্ফ ক্রিয়া চলছে। আমি স্থিরভাবে কিছুই ভাবতে পারছিনে। পথ কাটার সিদ্ধান্ত গতকাল গ্রহণ করেছি। কিন্তু কিভাবে? কোনদিকে কাটবো সেটিই হলো আসল কথা।

শ্যামা আজকে যা বলেছে তাতে আমিও কিছুটা প্রযত্ন প্রয়াস ব্যয় করেছি। তার অনেক কিছুর অভাব আছে জানি, নারীসুলভ মিথ্যে সেও বলে। তবু বারবার তার কাছে যেতে হয়। আজকের ঘটনা তার প্রমাণ। আমি জানিনে, কোনো গোপন দলের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে কি না। যদি থাকে তার এবং আমার জন্য খুবই দুঃখজনক হবে। সে ঠিক রাজনীতি করার উপযুক্ত নয়। আর গোপন রাজনীতির ভবিষ্যত এদেশে অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে। চীনের চেয়ারম্যান কি করে আমাদের চেয়ারম্যান হতে পারেন, আমি ঠিক বুঝতে পারিনে। সে যাক, তবু মাঝে মাঝে মনে হয় শামীমকে আমি ভালোবাসি। য.প্রা. মেয়েটা বোধহয় ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ সে এমন একটা কিছু গোপন করছে এবং সে গোপনীয় বিষয়টা আবার এমন কতিপয় মানুষ জানে, যার ফলে তাকে কতেক শিক্ষিত গুণ্ডার মন যুগিয়ে চলতে হচ্ছে। আমার চোখে এটা অধঃপতন মনে হচ্ছে। মেয়েরা ঠিক এরকমই হয়ে থাকে। যে কাকের মতো নিজের চোখ বন্ধ করে কিছু

লুকিয়ে মনে করে আর কেউ দেখতে পেলো না। আমি যে রকম ভেবেছি হেলালও একই রকম ভেবেছে। হুমায়ুনের মৃত্যুটা একটা রহস্য হলেও কিছু কিছু আলোক যেনো দেখতে পাচ্ছি। এটা কি রাজনৈতিক হত্যা? নাও হতে পারে। আমার তো মনে হয় পারিবারিক কোন্দল, ব্যক্তিগত শত্রুতা, নারী, যৌনতা এসব কারণও হতে পারে। আবার সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে ওপরে একটা রাজনৈতিক আবরণ থাকতেও পারে। হুমায়ুনের ছেলেমেয়েকে ভালোবাসি। তার স্মৃতি স্নেহভরে লালন করি— কি জানি কেনো তাকে শ্রদ্ধা করতে পারিনে। মানুষ হিসেবে বোধ হয় সে খুব উদার ছিলো না। এই কি কারণ? আজকে আবার একটা অবাক ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। কাগজে আমার রাশিতে দেখলাম আজ আমার সম্মান বাড়বে। কিভাবে যে সম্মান বাড়বে কল্পনাও করতে পারিনি। কিন্তু খেতে যেয়ে খবর পেলাম আমাকে আন্তর্জাতিক ইতিহাস সেমিনারে প্রবন্ধ পড়ার জন্য মনোনীত করেছেন। গত পরশুও এ ধরনের একটা ব্যাপার ঘটে গেছে।

আমাকে আরো চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠতে হবে। গুটিকয় কু-অভ্যেস ছেড়ে দেবো। রেবুদের ওখানে যাওয়া বাদ দেবো। কোলকাতার স্মৃতিটা লেখার চেষ্টা করতে হবে। এক একটা দিন কেমন গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। জীবনটা ভারী হয়ে উঠছে।

৬ মার্চ, ১৯৭৩

আমার জীবনটা দুঃখময়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এই দুঃখটাকেই আমি ভুলে থাকি। বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ততা এবং অনপেক্ষতা নিয়ে বেশিরভাগ সময়ে কাজ করতে পারিনে। তাই চরিত্রের দুই বিপরীতমুখী শক্তির মধ্যে একটা মাঝবিন্দু আবিষ্কার করা প্রায়ই ঘটে না। একদিকে অংক, শীতল চুলচেরা যুক্তি, বিতর্ক, বিচার এবং অন্যদিকে অপরিমিত আবেগ — এই দু'য়ের একটা সমতা সাধন করতে পারিনি — না জীবনে, না শিল্পে। তাই আহমদ ছফা বলতে ক্ষেপা, একগুঁয়ে, কালাপাহাড় ধরনের এক ধারণা সকলের মনে উদয় হয়। অথচ নির্জন মুহূর্তে, দুঃখের সময়ে আমি নিজের মধ্যেই কতো মহত্বের সমাবেশ দেখতে পাই। আমার সম্বন্ধে সবচাইতে ট্রাজেডি হলো, আমি নিজের মধ্যে ডুবতে পারিনি। কম বয়সে যে-রকম তন্ময়তা অনুভব করতাম, যার প্রসাদে বাস্তবের বিষদাঁতের স্পর্শ ভুলে থাকতাম, ইদানীং মনে হচ্ছে হারিয়ে ফেলেছি। এভাবে যদি দীর্ঘদিন চলে মানসিক সমস্ত সৌন্দর্য হারিয়ে বসবো। নিজেকে বারেবারে প্রশ্ন করি, আমি কি সত্যিকারভাবে নারী বিদ্বেষী? নাকি মনের মতো মেয়ে মানুষ পাইনে বলেই এ রকমের হাসফাঁস করছি। মেয়েদের মধ্যে স্থিরতা এবং সরলতা এ দু'টো গুণকেই আমি দাম দেই। অথচ যাদের সঙ্গে দেখি, কথা বলি এমনকি যারা স্বপ্নে এসে চরিত্র হনন করে, তাদের কেউ যেনো আমার যোগ্য নয়। আমার ভেতরে কি প্রচণ্ড অহংকার শিলাময় পর্বতের মতো জমাট বেঁধে আছে? নিজেও টের পাইনে। কখনো কখনো তার ঋজু কঠিন চেহারা দেখে নিজেই ভয় পেয়ে যাই। যতোগুলো মানুষ

দেখেছি আমার চাইতে দুঃসাহসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও জেদী কোনো মানুষ এ পর্যন্ত দেখিনি। কখন, কি করে যে আমার মনের মধ্যে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াবার ধারণা গেঁথে গেছে নিজেও জানিনে। যখনই কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্টতায় এসেছি আমার সে উদ্ধত অহঙ্কৃত আত্মবিশ্বাসে ঘা লাগে, প্রেম-টেম সব কোথায় চলে যায়। নেপোলিয়নের জীবন আমাকে সবচাইতে প্রভাবিত করেছে। বিশাল আকাশের মতো মনসম্পন্না একজন মহিলা আমার চাই। সুউচ্চ হিমালয় যেমন করে তুঙ্গশৃঙ্গে বিরাট আকাশকে অনায়াসে উঁচু করে রাখতে পারে, তেমনি একখানি বিশাল হৃদয় আমার চাই। যতোদিন না পাই, চলতি মহিলাদের পায়ে দলে যাবোই। তার মানে এই নয় যে, মহিলাদের আমি অসম্মান করি বা নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নই। কিন্তু কি করবো, মনের সঙ্গে মেলে না, তাই ছেড়ে যাই। ব্যথা কি নিজে পাই না? খুবই ব্যথা পাই। পাঁজর ভেঙ্গে যেতে চায়। কাউকে শখ করে ব্যথা দেইনি, অনেকে ব্যথা পেয়েছে। সবসময়ে এমনকি ঘুমে, আধঘুমেও আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা আমার লক্ষ্যের দিকে কম্পাসের কাঁটার মতো এমনভাবে হেলে থাকে যে তারা যে-রকমটি প্রত্যাশা করে সে-রকম আচরণ করতে পারিনে। আমি যদি কিছু অসাধারণ না করতে পারি— এই না করার ব্যথা বুকে নিয়ে মারা যাবো। নিজেকে নিচে নামাতে পারবো না। জীবনের কাছে আমার প্রার্থনা, হে জীবন, তুমি যদি দ্রুত পক্ষ ঈগলের মতো অভীষ্ট অভিমুখে বাতাসে ভর করে ছুটতে না পারো, সেইখানে থেমে যেয়ো। কর্মহীন, গর্বহীন আমাকে কেউ যেনো জীবিত দেখতে না পায়। আমি যেনো লোভের কাছে, মোহের কাছে, হীনতা, পরবশ্যতা এবং আলস্যের কাছে পরাজিত না হই। প্রতিদিন জীবনের দিকে এই যে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে তাকাচ্ছি, এতে একটি লাভ হচ্ছে। নিজেকে আরো ঘনিষ্টভাবে চিনতে পারছি। দায়িত্ব এবং লক্ষ্যের চেহারা আর মাঝপথের ধাপগুলো স্পষ্ট আকার নিচ্ছে। লোকে যাই বলুক, যাই অনুভব করুক নিজের কাছে আমি অনন্য। দুঃখগুলো হজম করতে পারি বলে, ব্যথাকে অপমান করিনে বলেই আমার সবটাই আমার। আমার জীবন আমারই নির্দেশ মেনে চলবে এ-রকম ভরসা অন্তত করতে পারি।

৭ মার্চ, ১৯৭৩

একেকটা দিন কতো তাড়াতাড়ি আসে আর কতো তাড়াতাড়িই-বা ফুরিয়ে যায়। আমার মুশকিল, আমি মনের টানে ভেসে যেতে পারিনে। বারোয়ারীভাবে মাতাল হতে পারার একটা সান্ত্বনা আছে। একটা বিষয় এখখুনি মনে পড়ে গেলো। বাইরের পারিপার্শ্বিক শক্তির চাইতে আমার চরিত্রের শক্তি অনেকগুণে বেশি। তাই আমার জীবনে কোনো চমক নেই। অনেকে আছে জীবনে নাটকের স্বাদ অনুভব করার জন্যে চমক সৃষ্টি করে থাকেন। প্রায়শঃ এমন হতে দেখি। অন্যের দৃষ্টিতে চমকপ্রদ হতে পারে, এমন ঘটনাও আমার দৃষ্টিতে নিতান্ত সাধারণ এবং আটপৌরে ঠেকে। যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্মানেও ভূষিত হই, তবু একটুও অপ্রস্তুত আমাকে হতে হবে না। তার কারণ আমার ভেতরে একজন বৈরাগী নিবাস করেন।

সকালবেলা রাজ্জাক স্যারের কাছে গিয়েছিলাম। উনি আমাকে স্নেহসহকারে গ্রহণ করেছেন, বই দিয়েছেন, সাহায্য এবং সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটাকে আমি সৌভাগ্য বলে মনে করি। লোকে যতোই বলুক, তাঁকে অসম্মান কিংবা অশ্রদ্ধা করার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাইনি। তিনি রওনকের সঙ্গে কাগজ বের করা নিয়ে কথা বলতে বললেন। পরে জানতে পেলাম, তিনি হার্ভাডের ডক্টর এবং মহিলা।

রেবুদের বাসায় এককাপ চা খেলাম। মেয়েটার মনে এমন দুশ্চিন্তা, দোদুল্যমানতা ঢুকেছে, চোখে-মুখে ছাপ পড়েছে। প্রত্যেক মানুষকে নিজের নিজের ব্যাপারে এতোটা তন্ময় থাকতে হয়, অপরের কথা চিন্তা করার অবকাশ কই। মাহবুব এবং আফতাবের অপসারণ সংবাদ শুনে মনে হলো বোমার স্প্লিন্টার বিঁধে গেলো। ক্ষোভে-রাগে শরীরে রক্ত টানটান হয়ে এলো।

চারদিকের আঁটোসাঁটো পরিবেশের মধ্যে হাঁফিয়ে উঠছি। কারো সঙ্গে মেলাতে পারছিনে। কী তীব্র বেদনা, বুকের ভেতরের চেকন স্নায়ুশিরাগুলো ইলেকট্রিক হিটারের মতো জ্বলতে থাকে। এই আগুন দিয়ে রান্না করতে পারবো না। ঘর জ্বালানো আগুন। নিজেকেই বোধ হয় ধ্বংস করে ফেলবে। সব মানুষকে অপূর্ণ, অসম্পূর্ণ, কল্পনাহীন, অসভ্য মনে হচ্ছে। এর কারণ আমার যথাযোগ্য ভূমিকাটি পালন করতে পারছিনে। এখনো আমার ভেতরে যুক্তিহীনতা, তামসিক প্রবৃত্তি এবং চিন্তাহীনতা রয়ে গেছে। তাই বাস্তবে মুখোমুখি তাকাতে পারছিনে।

আজ বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী পুতুল খেলা হয়ে গেলো। কাউকে ভোট দিতে হয়নি, খুশি হয়েছি তাই। ছাদে যেয়ে শামীমকে দেখতে চেষ্টা করেছি। মেয়েটা ভয়ে কেঁচো হয়ে গেছে। সার্তের 'Age of reason' পড়েছি। বিকেলে রেবুদের বাড়ির গোড়া থেকে ফিরে এসেছি। ওদের ওখানে আসর বসেছে। দুঃখের বিষয় আমি আসরের মানুষ নই— আমি নির্জন মানুষ এবং আমার প্রকৃতি বিষণ্ন। বেশিক্ষণ উল্লাস সহ্য করতে পারিনে।

১০ মার্চ, ১৯৭৩

আজ সকালে উঠেই একটা অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হলাম। আনিস তাকে উপহৃত 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' খুলে দেখালো যে, স্নেহাস্পদেষু লিখে আমি ভুল করেছি। ক্যান্টিনে যেয়ে আরো এক বীভৎস দৃশ্য দেখলাম। ওবায়দুর রহমান নামে এক ভদ্রলোক ক্যান্টিনের ছেলে মুশাররফকে একটা ঠাস করে চড় দিলেন। ছেলেটার কোনোও অপরাধ ছিলো না। চড় খেয়ে ঝরঝর কেঁদে গেলো। গোটাদিন তার কান্নার দৃশ্যটি ভুলতে পারিনি। মানুষ এমন নিষ্ঠুর হয়, আর দুর্বল পেলে এমন অত্যাচার করে। বাংলা একাডেমীতে দুঃসংবাদ শুনলাম। 'স্বদেশ' দ্বিতীয় সংস্করণ একাডেমী ছাপবে না। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়েছি মযহারুল ইসলামকে পেটাবো। অনেকক্ষণ অপার তর্জন করে

অফিসে গেলাম। সেখানেও ব্যর্থ হলাম। নুরুল হুদা সঙ্গে ছিলো। তারপর কাজী ফারুকের দোকান হয়ে 'সমকাল'। সিকান্দার আবু জাফর সাহেব ক্রমাগত মানবতা হারিয়ে ফেলছেন। এখন তাঁর সত্তার সমস্ত আলো মরে গেছে। ফিরে রাজ্জাক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পেলাম না। দেখলাম, আহমেদ কামাল তার প্রেয়সীকে নিয়ে গল্প করছে। নওয়াবের সঙ্গে দেখা হলো। সে আজ খুব মনমরা। মুস্তফার অসুখের খবর শুনলাম। এসে হোসনে আরার চিঠি পেলাম। খেয়ে তারপর ঘুমালাম। ঘুম থেকে উঠে রিকশা করে নিউ বেইলী রোডে হোসনে আরার খোঁজে যাওয়া হলো। দিনটাই অপয়া। মহিলা নেই। তারপরে একদম লাইব্রেরিতে। শিক্ষকেরা যেখানে পড়াশোনা করেন, কৃষ্ণলীলা দেখলাম। আশ্চর্য। একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বই পড়লাম। বইটায় সত্য-মিথ্যে যাই থাকুক, একটা গুণ আছে। মনটাকে একেবারে একমুখী করে এনেছে। অস্তিত্বকে একেবারে নতুন করে অনুভব করতে পারছি। মুস্তফাকে দেখতে গেলাম। সে নেই। এখন খেতে যাচ্ছি।

১১ মার্চ, ১৯৭৩

আজ খুব সকালে বিছানা ছেড়েছি। দাড়ি কেটেছি। স্নান করেছি। পূর্বদিনের প্রতিজ্ঞা মতো শুধু কলা দিয়েই সকালবেলার টিফিন সেরেছি। তারপরে Lenin-এর 'Development of Capitalism in Russia' বেশ কিছুদূর পড়লাম। এ বই গেলার উপায় নেই। চিবুতে হলো। লেনিন সাহেব ভালো মানুষ, পণ্ডিত মানুষ। বইগুলো আর একটু সরল করে লিখলে বিপ্লবের বোধ হয় বেশি ক্ষতি হতো না। রেবুর বাসায় গেলাম। সভা হলো— যদি একে সভা বলা যায়। মনোয়ার, সাঈদ আর নওয়াব তিনজনের ওপর বইয়ের সব দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া হলো। সাঈদ আর মনোয়ার পাবেন দু'শো টাকা করে আর নওয়াব পাবেন একশো টাকা। প্রসঙ্গের বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম একা আমি। ভাবতে ভালো লাগছে যে, রেবুদের বাড়িতে আজকে অনেকটা স্থির থাকতে পেরেছি। এই স্থিরতাটা প্রয়োজন। নয়তো আমি প্রলোভনের কাছে পরাজিত হবো। আমি ধারালো তলোয়ারের ওপর দিয়ে হাঁটছি। সরলতা এবং সততাই আমার মূলধন। সকলের সঙ্গে সবদিক দিয়ে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক যদি রাখতে পারি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো। আলী মনোয়ারের একটা রচনা শুনলাম। তিনি যেখানে বেশি মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন সেখানটিতেই এড়িয়ে গেছেন। এটা মধ্যবিত্ত চরিত্রের একটা মারাত্মক বিভ্রান্তি। তারা হয়তো চিন্তা করে ঠিক, কিন্তু কাজের বেলায় করে উল্টো। আজ সত্যি সত্যি নিরামিশ দিয়ে খেলাম। দুপুরে ঘুমুতে চেষ্টা করেছি। শামীম আর হোসনে আরা এসেছিলেন। খুব শিগ্‌গির চলে গেলেন। আমি কলেজে গেলাম। আগামীকাল থেকে লেডিজ ক্লাবে যেয়ে হোসনে আরাকে dictation করা স্থির হলো।

সন্ধ্যেবেলায় অসীম এলে হোস্টেলের সামনে একটা গানের আসর বসলো। চমৎকার

কীর্তন গাইলো অসীম। আমি আর আনিস শামীমের কলেজের সামনে দিয়ে হেঁটে এলাম। মুজিববাদী ছেলেরা ভয় ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। আমি কিছু বলবো না। শরীফ স্যারের বাড়িতে গিয়েছি। আজ রাতে একটা কবিতা লিখেছি।

১২ মার্চ, ১৯৭৩

মেয়েদের একটা চমৎকার শক্তি আছে। এতোদিন হতাশ অবস্থায় কাটিয়ে এসেছি। গতকাল হোসনে আরাকে ডিকটেশন দেয়ার কথা স্থির হওয়ার পর নতুনভাবে কাজ-কর্ম করার স্পৃহা অনুভব করছি। সকালে উঠেই নাস্তা করার পর লেনিনের 'Development of Capitalism in Russia' পড়েছি। গোটা এক অধ্যায়। তারপর রাজ্জাক স্যারের কাছে। স্যার আমাকে নোটটা করে দেখাতে বললেন। লাইব্রেরিতে ঢুকলাম। 'Day after life' বইটি আমি যে কেনো পড়ছি নিজেও জানিনে। জীবনে কি ধ্যানের কোনো স্থান আছে? দেবসত্তা জাতীয় কোনো কিছু যদি সৌরলোকে থেকে থাকে অন্তত আমি সান্ত্বনা পাবার মতো কিছু পাবো। সূর্যের মহিমা শুনতে ভালোলাগে। এখনো মর্মগতভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি। অস্পষ্টভাবে হলেও তিনি যে তেজ, বীর্য, শক্তি এবং প্রাণের প্রতীক সেটুকু বুঝতে পারি। আমি ভাবছি সূর্যালোকধর্মী মানুষদের কথা। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সুভাষচন্দ্র বসু মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল রোদ্দুর দিয়ে গড়া। জীবনে এবং জীবনের সাধনায় প্রচুর তেজীয়ান রৌদ্র ধারণ করার নামই কি সত্য সাধনা? হায়রে আমি কতো অসহায়! আমার মধ্যে যেনো spirit বলতে কিছু নেই। রক্ত-মাংসের দাবি আমাকে এমনভাবে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, চোখ মেলে দূরের জিনিষের দিকে তাকাতেই পারছিনে। সে যাক, আসার পথে রেজিস্ট্রার অফিসে দ্বিতীয়বার জেনে এলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিটা আমিও পেয়েছি। কক্ষে এসে সিরাজ এবং নীতীশের চিঠি পেলাম। বাড়ির জন্য মনটা হু হু করছে। এতো টাকা কি করে যোগাড় করবো বুঝতে পারছিনে। আজিমপুর যেতে একটু দেরি হলো। হোসনে আরা একটু অপেক্ষা করে নাকি চলে গেছেন। বারোটা পর্যন্ত তার বসা উচিত ছিলো। এসে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে উঠে নোট করতে বসলাম। ফজলু এলো। একটু পরে নওয়াবকে নিয়ে শামীমের হোস্টেলে গেলাম। তার শিক্ষক জনাব দেলোয়ার হোসেন খানের সঙ্গে দেখা হলো। আজকের দিনটা শান্তভাবে কাটলো।

১৩ মার্চ, ১৯৭৩

আজ খুব সকালে উঠেছি। গতরাতেই লিখেছি, এখন থেকে আমার কাজ-কর্ম যেনো নতুন একটি দিকে, একটি নতুন কেন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে। যতোই আমি প্রবৃত্তিকে জয় করতে পারছি ততোই যেনো হালকা হয়ে উঠছি। এসব নিরামিষ ভক্ষণের ফল কিনা বলতে পরবো না। মহিলার প্রভাবও হতে পারে। আমার ঠিক অগ্রগতি হচ্ছে না, হয়তো হতে পারে এসব নিছক মনের কল্পনা।

কলেজে যেয়েই শ্যামাকে পেলাম। মেয়েটাকে দেখে মনে হলো এই প্রথম দেখলাম। অনেক বদলে গেছে। প্রতিটি স্পর্শেই কেঁপে ওঠে। আর্টস কলেজের চত্বরে বসেছিলাম দু'জন। শিশুসূর্য একটু একটু বিস্ফারিত হতে লেগেছে, লতা-গুল্মগুলো দুলে দুলে যাচ্ছিলো, একটানা কোকিল ডাকছিলো, সর সর হাওয়া বইছিলো। এই ধরনের পারিবেশে একটা যৌবনবতী নারীর সঙ্গে বসে গভীর গাঢ় কথা উচ্চারণ, তার কি আবেশ, কি পুলক আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। শ্যামাকে বলতে ইচ্ছে হয়েছিলো— কথাটা জিভের ডগায় অনেকক্ষণ ঝুলেছিলো, আমার বৌ হবে? শেষ পর্যন্ত বলা হয়নি। সেকি আমার বৌ হবে?

লাইব্রেরিতে কিছুক্ষণ শংকরের 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' উপন্যাসখানা পড়লাম। তারপর আজিমপুর লেডিস ক্লাবে যেয়ে হোসনে আরাকে ঘন্টা দেড়েক ডিকটেশন দিলাম। এসে খেয়ে ঘুমোলাম।

ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে বাংলাবাজার। শ্যামার কলেজে যাই যাই করেও যাওয়া হলো না। প্রকাশভবন পরশুদিন টাকা দিবেন বললেন। আনিস সঙ্গে ছিলেন। কবি জসীমউদ্‌দীন সাহেবকে 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' খানা উপহার দিলাম। আতিকদের বৌভাতের নিমন্ত্রণটা গ্রহণ করতে পারলাম না। খুব গাঢ় ইচ্ছেও আমার ছিলো না। রেবুদের বাড়িতে গেলাম। নওয়াবকে পেলাম না। এখানে নাকি অধ্যাপক স্বপন আদনান আমার অপেক্ষা করে গেছেন। হলে এলাম। এখানেও নাকি তিনি এসেছিলেন।

১৫ মার্চ, ১৯৭৩

মাঝখানে একদিন ডায়েরি লিখিনি। সকালে উঠে সায়ীদসহ বাণিজ্য মন্ত্রী এম. আর. সিদ্দিকীর বাসায় গেলাম টি.সি.বি-র কাপড়ের মঞ্জুরির জন্য। হলো না। আর্ট কলেজে এসে শ্যামার সঙ্গে বসে চা খেলাম। তারপর রেজিস্ট্রারের অফিসে গেলাম। আজিমপুরে যেয়ে হোসনে আরাকে খবর দিয়ে এলাম, ক'দিন কাজ করতে পারবো না। আই.আর.সিতে ড. ওয়াজিহুর রহমানকে খোঁজ করলাম, পেলাম না। এসে টেলিফোনে এম. আর. সিদ্দিকীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে পেলাম না। অস্ত্রোভস্কির 'ইস্পাত' বইটির দু'টি খণ্ড ধারে কিনে এনেছি। খেয়ে এসে ঘুমোতে চেষ্টা করে পারলাম না। অস্ত্রোভস্কি পড়তে শুরু করলাম। নওয়াব এলো। বাংলাবাজার গেলাম। কে জানি মরেছে, বাংলাবাজার বন্ধ। হেঁটে হেঁটে, রেবুর বাসায় এলাম। সেখানে নওয়াব এবং অরুণ এলো। প্রসঙ্গের বিজ্ঞাপন ফর্মটা তৈরি করলাম। এসে খেয়ে এম. আর. সিদ্দিকীর বাড়ি যেয়ে অনুমোদন নিয়ে এলাম। অস্ত্রোভস্কি শেষ করলাম। বাড়িতে এবং শ্যামাকে চিঠি লিখলাম।

১৬ মার্চ, ১৯৭৩

গতরাতে আমার ঘুম হয়নি। তার কারণ নানারকম। গতদিন সকালে শ্যামার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, এম. আর. সিদ্দিকীর বাড়িতে যেয়ে কাজ হয়নি, শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্রে ড. ওয়াজিহুর রহমানকে পাইনি। হোসনে আরার সঙ্গে দেখা হয়নি। দুপুরে মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি এবং বিকেলে বাংলাবাজার অবধি যেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসা—এর সবগুলোই তার কারণ হতে পারে। প্রায় না ঘুমিয়েই রাত কেটেছে।

আজ সকালে একটু দেরিতে ঘুম ভেঙ্গেছে। হ্রাসকৃত পরিমাণ নাস্তা করে বাংলাবাজার গিয়েছি। ঘুরে ঘুরে ছেলেদের বই যোগাড় করেছি। প্রকাশ ভবনের হক সাহেব অনেক দেরি করালেন। শেষ পর্যন্ত যখন টাকা পেলাম ডাকঘর বন্ধ হয়ে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি হলে চলে আসতে হলো। শুনলাম কাপড় পাবে— এ আনন্দে সকলে জয়ধ্বনি করছে। কতো অল্পে সন্তুষ্ট এই মানুষ। কি দুর্বার তার লোভ! শ্যামাদের কলেজে গেলাম। তাকে বিশ টাকা দিলাম। মেয়েটাকে আজ নিষ্প্রাণ মনে হলো। এসে ঘুমোতে চেষ্টা করেও পারলাম না। বইগুলো প্যাকেট করে জিপিওতে চলে গেলাম। বাড়িতে ১২০ টাকা মনি অর্ডার করলাম। আর বইগুলো ছেলেদের কাছে রেজিস্টার্ড বুক পোস্ট করে পাঠালাম। তারপরে শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনে এসে এককাপ চা খেয়ে নিলাম। নুরুল হুদা আর হেলালকে নিয়ে রেবুদের বাড়িতে গেলাম। ওখানে গানের আসর বসেছে। আমি একাকী বিষন্ন মানুষ। চলে এসেছি। ভালো লাগে না। দিনটা অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যদিয়ে কেটেছে।

নিজেকেই প্রশ্ন করছি, এই সমাচ্ছন্ন অন্ধকারে আমি কি নিজের গন্তব্য অভিমুখে অগ্রসর হতে পারছি? এখনো তো কর্তব্যকর্মের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারছিনে। প্রচণ্ড একটা আমিত্ব এখনো চারদিকে বেষ্টনী রচনা করে রেখেছে। চারদিকে যশ, মান, সফলতা এবং কামনার স্রোত ইছে প্রবল বেগে, অথচ আমি যেনো কিছুতেই নেই। বড়ো ক্লান্তি বোধ করছি। মা এবং ভাইয়ের ছেলেদের কথা মনে পড়ছে। আমাকে পরিবারের প্রতি কর্তব্য করতেই হবে। তার রূপরেখাটি এখনো আভাসিত হয়ে উঠেনি। আমি যেনো জীবনকে সামনাসামনি অনুভব করছি।

১৭ মার্চ, ৭৩

আজ খুব সকালে জেগেছি। নাস্তা করে শ্যামার কলেজে গিয়েছি। তাকে একটা প্রশ্ন মুখে মুখে বলেছি। মেয়েটি দিন দিন সুন্দরী এবং রহস্যময় হয়ে উঠছে। এখন আমার সঙ্গে তার পরিচয় আছে এটা সকলকে যেনো গর্ব ভরে দেখাতে চায়। সবকিছু শান্তভাবে গ্রহণ করতে পারে। আমরা দাঁড়িয়েছি দু'জনে, হঠাৎ শ্যামা একজন লোকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সেই জাহাঙ্গীর। আমাদের হোস্টেলের ১০৯ নম্বরে থাকে।

ছেলেটা কি শ্যামার প্রেমে পড়লো? এসে লেনিনের বইটির প্রায় ২০০ পৃষ্ঠার মতো পড়লাম। দুপুরের খাবার খেয়ে ঘুমোলাম। ঘুমের মধ্যে এলো আনিস। তারপর ফজল আহমদ। তারপর সবদার সিদ্দিকী। বেশকিছুক্ষণ ঘুমিয়ে হুমায়ূন আহমেদের বাসায় যাওয়া হলো আনিসসহ। ওদের ওখানে গেলে এক ধরনের বিষন্নতাবোধ আমাকে ছেয়ে ফেলে। মনে হয় নির্যাতিত, নিপীড়িত বিহারীরা আমার কানে ফিস ফিস করে কথা বলে। ওহ্ আজকে দুপুরে আমি ভাইকে স্বপ্নে দেখেছি। ঘুম একটু তরল হয়ে এলো। সিরাজ ছেলেটার প্রতি গভীরতম মমতা অনুভব করলাম। মনে মনে শপথ নিয়েছি তাদের জন্য কিছু না করে জীবনের অন্য কোনো ব্রত পালন করবো না। বাংলাদেশের ইতিহাস লেখার সমস্যা নিয়ে জনাব মতিনউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো।

১৮ মার্চ, ৭৩

আজ ভোর হবার আগে ঘুম ভেঙ্গেছে। পয়লা চোখ মেলতে ইচ্ছে করেনি। তারপর 'ইস্পাত' বইখানার বেশ কিছুদূর পড়ে স্নান করতে গিয়েছি। নাস্তা খাওয়ার পরে 'Development of Capitalism in Russia' বইখানির বেশ কিছুদূর পড়লাম। ন'টার দিকে হবে বোধহয়, রেবুদের বাসায় গেলাম। একটা দোতারা কিনলাম। এই যে স্বতঃস্ফূর্ততা আমার চরিত্রের কি করে যে ঢেকে রাখবো বুঝতে পারছিনে। দু'টো টাকা জলে গেলো। নওয়াব বাসায় নিয়ে এলো। সে এডগার স্নোর বইখানি পড়ছে। ফজল আহমদ এবং আর দু'জন এলেন। একজন তার শ্যালক। বই জোগাড় করে দিতে হবে। ভাত খেলাম। কাপড় ধুয়ে দিলাম। ঘুমোলাম। মনওয়ার এবং মসি এসে জাগালো। মসি ছেলেটাকে আমি ভয়ঙ্কর অপছন্দ করি। মনে হয় ছেলেটা কি একটা মতলবে ঘুরছে। আমার ধারণা হুমায়ুনের মৃত্যুরহস্যটা সে জানে। দিনে দিনে এ ধারণাটা আমার মনে পরিষ্কার রূপ লাভ করছে। কেমন জানি মনে হয়, ছেলেটার হাতে রক্তের দাগ লেগে আছে। এ ধরনের ছেলেদের কি করে এড়িয়ে চলবো সেটা একটা সমস্যা। রেবুদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে সম্ভবত। এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করতে পারিনি। আশা করছি এরই মধ্যে নতুন কোনো তথ্য জেনে যাবো। ফরহাদ মজহারের আমেরিকা পলায়ন, সালেহার সঙ্গে স্বামীর পুনর্মিলন এ সবের সঙ্গে বোধ হয় হুমায়ুনের মৃত্যুর একটা সম্পর্ক জড়িত রয়েছে।

দুপুরে 'ইস্পাত' বইটি শেষ করলাম। আশ্চর্য বই। আমিও তো এই লেখকের মতো। তবু বারেবারে কেনো ভুল করি বুঝতে পারিনে। আমিও তো ঝড়ের সন্তান। কিন্তু নিজের ভেতরে এতো স্ববিরোধী বিস্তর সমাবেশ দেখে নিজেই বিস্মিত হই। এখন কাজের কথায় আসি। লেনিনের বইটা প্রায় শেষ করে এনেছি। এ সময়ে জিন্নাত আলী এলেন। তাঁকে খুবই অন্যরকম দেখলাম। তিনি কাগজ বের করার প্রস্তাব করলেন। আমিও রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু কেনো যে রাজি হলাম নিজেও ঠিকমতো বুঝতে

পারলাম না। এখন চিন্তা করে দেখছি উনার সঙ্গে আমার মানসিকতার সামান্য মিল থাকলেও আমরা দু'জন দু'রকমের মানুষ। তাঁকে নিয়ে আবার রেবুদের বাসায় বসলাম। মিয়া ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলাম। ভালো করলাম কিনা জানি না। ভানিয়াকে নিয়ে সাঈদ, আনিস আর আমি নওয়াবদের বাড়িতে গেলাম। প্রয়োজন ছিলো না। মিছিমিছি টাকা নষ্ট। ভানিয়া ছেলেটাকে এতো ভালো লাগে, বড়ো ভয় হয়, রেবুটা ছেলেটাকে নষ্ট করে ফেলবে। কারণ মেয়েটা এরই মধ্যে প্রতিদিন হাল্কা হবার সাধনা করছে। আবার মনির সঙ্গে দেখা হলো। খুব খারাপ লাগলো। কোনো কোনো মানুষকে এতো খারাপ কেনো লাগে বুঝতে পারিনে। আমি কি ছেলেটাকে ঈর্ষা করছি? কেনো ঈর্ষা করবো? কিসের জন্য ঈর্ষা করবো? বারবার নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখেছি, রেবুর কাছে কি কোনো প্রত্যাশা আছে? জবাব পেয়েছি, না। তাহলে কেনো অপছন্দ করি? তরুদের বাসা, সনজীদা খাতুন এবং সালেহা খাতুনদের বাসায় করুণ অভিজ্ঞতার পর আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে, ঘরপোড়া গরু সিন্দুর মেঘ দেখলে ভয় পায়।

আমি কি মনে মনে দুর্বল? না'হলে এ-সব আবোলতাবোল বিষয়ে এতো ভাবছি কেনো? নোংড়া কথা চিন্তা করলে মনটাও নোংড়ামিতে ভরে ওঠে। সন্ধ্যেবেলা মেয়েদের হলগুলোর সামনে দিয়ে যেতে আসতে আমার কষ্ট হয়। ছেলেমেয়ের প্রেম আরো উন্নত, আরো সুন্দর এবং পরিশীলিত কোনো বস্তু বলে মনে হয়। আমার চারদিকে লাভ, লোভ এবং রিরংসার স্রোত বইছে। আমি নিজে যে কি করে মুক্ত থাকবো বুঝতে পারছিনে। আমাকে বুঝে, আমার মার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না এবং ছেলেমেয়েদের প্রতি দায়শীলা কোনো মহিলার দেখা কি জীবনে পাবো না? শামীম কি এরকম একজন মহিলা হতে পারবে? মেয়েদের আমি যৌনযন্ত্রের অধিক কিছু মনে করি।

রাতে খেতে পারলাম না। বেশি চা খাওয়ার কুফল হাড়ে হাড়ে অনুভব করলাম। কালকে সারাদিনে দু'কাপ চা-এর বেশি খাবো না। অনেকদিন থেকে মনে মনে চিন্তা করছিলাম সিগারেট ছেড়ে দেবো। দুয়েকবার চেষ্টা করেও পারিনি। অথচ সিগারেট ছেড়ে দেয়া প্রয়োজন। আজ স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম আর কোনোদিন সিগারেট খাবো না। লেনিনের বইটি শেষ করলাম। এতোটা বিরক্ত হয়েছি যে 'Appendix' টি পড়ার প্রবৃত্তি হলো না।

নিজের উপর আমার কোনো কর্তৃত্ব আসেনি। মনের দিক দিয়ে অনেকাংশে কাঁচা এবং স্থূল হয়ে গেছি। তাই অনেক সময় ইতর রসিকতা করতে আমার বাধে না। মনে হচ্ছে নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে আমি ভয় পাই। নিজের দুর্বলতাগুলোর উপর সবসময় একটা আবরণ রেখে ভাসাভাসাভাবে আশাবাদ আমি পোষণ করে থাকি। এ ধরনের মনোভাব সাংঘাতিক ক্ষতিকর। নিজের কাজে, কথায় এবং সৃষ্টিতে এ জাতীয় চিন্তার প্রভাব এতো বেশি যে, অনেক সময় মনে হয় এখনো মানুষের স্তরে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু মানুষে রূপান্তরিত হবার তীক্ষ্ণ তাগিদ মর্মের গভীর থেকে অনুভব করছি।

এই সময়ের মধ্যেও কাজের চিন্তায় এবং সঙ্গী-সাথী, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে একটা মমতা বিধান করতে পারলাম না। প্রায়ই আমাকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে হয়। মনের কাঙালপনা সম্পূর্ণরূপে কখন বিসর্জন দিতে পারবো? কখন লোভ, মোহ এবং কাম আদি রিপুগুলোকে জয় করতে পারবো? এ-সবের অতীত হতে না পারলে কিছু করতে পারবো না। শরীরে, মনে আমি যে কি কঠোর সংগ্রাম করছি, তবু আমি তো পুরোনো আমিই থেকে যাচ্ছি। নতুন বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে আমাকে নতুনভাবে জন্ম দিতে পারছিনে। আমার যশ চাইনে, নাম চাইনে, টাকা চাইনে, কর্তৃত্ব চাইনে — আমি চাই আমার নিজের মনের মতো মানুষ হতে। মানুষ সম্পর্কে মনে যে ধারণাটি আছে সে-রকম হবার জন্য সর্বশক্তি আমাকে নিয়োগ করতে হবে। তার প্রথম পদক্ষেপ সিগারেট বর্জন, দ্বিতীয়ত রেবুদের বাসায় যাওয়া কমানো, আনিসদের সঙ্গে ব্যবহারে শিথিলতাটি আবার দৃঢ় করে তোলা এবং শ্যামার সঙ্গে সব কথা ধীরে ধীরে খোলাখুলি আলোচনা করা।

১৯ মার্চ, ৭৩

সে যান্ত্রিক পদ্ধতি। খুব সকালে গাত্রোত্থান। নাস্তান্তে রাজ্জাক স্যারের বাড়িতে গমন। তাঁকে লেনিনের বই থেকে নেয়া নোট দেয়া হলো। আমি রজনী পাম দত্তের 'India today' বইখানা চাইলাম। স্যার দিতে পারলেন না। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ড. জগদীশ হালদারের কক্ষে যাওয়া হলো। তিনি এক্স-রেটা বিনি খরচে করিয়ে দিলেন। রেবুদের বাসায় যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও কি কারণে জানি যাওয়া হলো না। আমি দেখতে পাচ্ছি আস্তে আস্তে ইচ্ছেটা বিশুদ্ধ হয়ে উঠছে। শামীমের ওখানে যেয়ে শুনলাম সে বেরিয়ে গেছে। লাইব্রেরিতে ঢোকার পথে তথাকথিত শুদ্ধি অভিযানের একটা বিশ্রী প্রচারপত্র চোখে পড়লো। কোনো মেয়ে যতো খারাপ হোক না কেনো, কুৎসা গাইয়ে কিই-বা শুদ্ধি করা হবে? যারা এই হার্মাদীপনা করছে তাদের চরিত্রও-বা কতোটুকু বিশুদ্ধ। ঘন্টাখানেক লাইব্রেরিতে অবস্থান করে রেজিস্ট্রার অফিসে গেলাম। ওয়াজিহুর রহমানের কাছে গেলাম। তিনি প্রবন্ধ দিতে পারলেন না। নিউ মার্কেটে যেয়ে দেনা শোধ করলাম। শামীমের কাগজ এবং Charcoal কিনলাম। এসে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। রেবুর দেয়া কলমটা ফিরে পেলাম। ঘুম থেকে উঠে ইংল্যান্ডের অর্থনীতির ইতিহাসটা পড়তে শুরু করলাম। খুব তীক্ষ্ণ লেখা। একটু আগে সিদ্দিকী এবং নওশাদ এসেছিলো। একটু দায়িত্ব নিয়েও কাগজ দিতে স্বীকৃত হলাম। কেনো যে মানুষ আমাকে এসে বিরক্ত করে বুঝতে পারিনে। আলী মনোয়ার এলেন। তাঁকে, নওয়াব এবং সাঈদকে নিয়ে প্রকাশ ভবনে গেলাম। হক সাহেবের কাছ থেকে দু'শো টাকা আগাম নেয়া হলো। তিনজনকে পঞ্চাশ টাকা করে দিয়ে দেয়া হলো। সারওয়ার প্রিন্টিং প্রেসে সাঈদের বইটি ছাপানো যায় কিনা খোঁজ করলাম। তারপর নওয়াবদের বাসা। গণকণ্ঠ। বদরুদ্দীন উমর সাহেবের বাসা। উমর সাহেব জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল

সম্বন্ধে যা বললেন অনেকটা সত্যের কাছাকাছি। রিকশায় করে ঘুরে এসে দেখি মৃনালবাবু আর হুদা বসে আছেন। আজকেও রেবুদের বাসায় না যেয়ে পারলাম। ধীরে ধীরে ওবাসাটা বাদ দিতে পারলে নিজেকে খুবই ধন্যবাদ দেবো। আজকের দিনটাতে কোনোই চমক নেই। তবু আশ্চর্য একটা প্রশান্তি লাভ করছি। রাতে অর্থনৈতিক ইতিহাসটা পড়বো এবং নোট নেবো।

২০ মার্চ, ৭৩

আজকের দিনটা বড্ডো অনিশ্চিতভাবে শুরু হলো। নাস্তা খাওয়া হলো। তারপর পড়তে বসলাম। কিছুক্ষণ পড়াশোনা করার পর রেবুদের ওখানে যাওয়া হলো। রেবু নেই। শামীমের ওখানে ইচ্ছা থাকলেও গেলাম না। আবার পড়তে বসলাম। প্রচণ্ড অস্থিরতা অনুভব করছি। একটা কিছু করা দরকার। আমি যে জেদি, একগুঁয়ে এবং প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী মানুষ তা কোনো সময়ে ভুলতে পারিনে কেনো। দুপুরে খেয়ে একটু ঘুমোলাম। তারপরে আবার T. S. Ashton-এর সেই ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক ইতিহাসটা খুলে বসলাম। আমি নিজেকে আবার নতুনভাবে আবিষ্কার করতে আরম্ভ করেছি। আমার যা দাম তা একান্ত আমারই। যদি আমি সোনা হয়ে থাকি সোনার দামই পাবো। যদি পেতল হয়ে থাকি সোনা বলে চালিয়ে কোনো লাভ নেই। হোসনে আরা ভদ্রমহিলাটি আবার লোক পাঠিয়েছেন চিঠিসহ। তাঁর জন্য কিছু করতে পারলে স্বস্তি পেতাম। পাঁচটা বাজে, কাপড় বিতরণ করার সভা হলো। মানুষ যে কতো শ্রেণী সচেতন, অনুদার এবং নির্লজ্জ তার অনেকগুলো দৃষ্টান্ত দেখলাম। সভা অন্তে সাইদ এবং আনিসসহ বাংলাবাজার। প্রকাশভবন পঞ্চাশ টাকা দিলো। আওলাদ হোসেন লেনে যেয়ে পাগলার দোকানে গ্লাসী (য.প্রা.) খেলাম। তারপর শামসুর রাহমানের বাড়ি। না গেলেই ভালো করতাম। আশপাশের মানুষেরা যে-রকম শ্বশুর সচেতন হয়েছে তা খুবই বিস্ময়কর। একমাত্র আমিই নির্বিকার। কেনো যে আমি নির্বিকার থাকছি বুঝতে পারছিনে। এ বিশ্বাস আমার হয়েছে যে, যা পারবে জীবন আমাকে দেবে। হৈচৈ করে লাভ নেই। শরীফ স্যারের বাড়িতে গেলাম।

২১ শে মার্চ, ১৯৭৩

এই জীবন আর দু'বার পাবো না। বিশেষত দিনের
আলো ফুরিয়ে গেলে আর কতো দূরে চলে যায়। সূর্য
ডুবলে মনে হয় কিছুই করিনি, কিছুই জানতে পারিনি।
দুপুরে ঘুম ভাঙলে মনটা বিষণ্ণ হয়ে থাকে। আমাকে
সমস্ত দিনের জ্ঞানী-গুণীর কাছে যেতে চাই, সবটা রস
আর ক্ষুদ্র হয়ে ক্ষুদ্র হয়ে নিজেকে ফুরিয়ে
যেতে চাই। তাহলেই এ জীবন সার্থক হবে,
নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া চাই। সবকিছুতে।
বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান যতো সবসময় শিখতে
পারিনি — তাদের বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান নিতে
চাইনি। তাদের সব তথ্য জানতে হবে,
তাদের জীবন পরিচিত হতে হবে অভিজ্ঞতাসহ
নিতে হবে। প্রত্যেক মূল্যবোধ-মতের
আমার মৈত্রী আমার হৃদয় প্রবীণ করে
হবে।

দিনের অর্ধেক কাটল। খুব সকালে ঘুম থেকে
উঠে স্নান এবং নাস্তা তাড়াতাড়ি করেছি। সুলতানের
ওখানে গিয়ে চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে গিয়েছি।
ওরা সব উঠে গেছেন, তাকে পাইনি।
সাড়ে আটটা পর্যন্ত কাটিয়ে দিয়ে চলে এলাম
লেখা শুরু করেছি। চৌধুরী সাহেব বাড়ি থেকে ফিরে
এসে আমাকে ডেকেছেন। [illegible]
এক আছে। [illegible]
হয়েছে। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

২১ মার্চ, ১৯৭৩

এই জীবন আর দু'বার পাবো না। একেকটা দিন কতো দ্রুত আসে, আর কতো দ্রুত চলে যায়। সূর্য ডুবলে মনে হয় কিছুই করিনি, কিছুই করতে পারিনি। বৃথাই চলে গেলো গোটা একটা দিন। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি লড়াই করতে চাই। লড়াই করে করে ক্লান্ত হয়ে হয়ে একেবারে ফুরিয়ে যেতে চাই। চারধারে যে বাঁধন অনুভব করছি। একেবারে ছিঁড়ে ফেলতে চাই। পারছিনে। নিজেকে আমি যথেষ্ট রকম সুশৃঙ্খল করতে পারিনি এখনো। নিজস্ব মতামত অনুসারে চলতে শিখিনি। অকাজে সময় ব্যয় এখনো করছি, এখনো জীবন বহির্ভূত বিষয় আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রথম সূর্যালোকের মতো আমার জীবনীশক্তি আমার ইচ্ছের অধীন কখন হবে?

দিনের কথায় আসি। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে ছাদে এবং মাঠে পায়চারী করেছি। মৃণালকে নিয়ে চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে গিয়েছি। এসব করা উচিত হচ্ছে না, বুঝতে পারছি। যাওয়ার পথে শ্যামাকে কার্টিজ এবং চারকোল পৌঁছে দিয়েছি। চৌধুরী সাহেবের বাড়ি থেকে এসে রেবুর বাড়িতে গিয়েছি। দেখলাম সসী বসে আছে। রেবুটা সালেহা খাতুন হতে চলেছে। অবশ্য এটা আমার অনুমান। সেখান থেকে এসে পড়তে বসলাম। বারোটা বাজে বাংলা একাডেমীতে গেলাম। এসে খেয়ে ঘুমোলাম। শ্যামা এবং তার বন্ধু এলো। তাদের নাস্তা করালাম। শ্যামা আবার টাকা চাঁইলো। দুপুরে স্টেডিয়াম ঘুরে আসলাম। অনুতাপের অন্ত নেই।

২২ মার্চ, ৭৩

এখনো গভীর অর্থে বাঁচতে পারছিনে। কাজ করার সময় মানসিক স্বাধীনতা এখনো পাচ্ছিনে। ইংরেজিতে যাকে বলে intense living. তা যে কখন পারবো জানিনে। আজকে কিছু কাজ করেছি। সে জন্য অনুতাপটা অতো প্রখর মনে হচ্ছে না। সে যাক, সকালে ন'টায় ঘুম ভাঙলো। দ্রুততার সাথে স্নান করে বেরোলাম। আগের রাতে দু'বার আত্মহনন করেছি। ক্লান্তি অনুভব করছিলাম। নিজের কাছেই নিজেকে ছোটো মনে হচ্ছিলো। লাইব্রেরিতে গেলাম। 'Sexual Life of Woman' বইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম। কেনো জানি না, যন্ত্রণাটা অনেকাংশে প্রশমিত হয়ে এলো। যে মহিলাকে গতকাল দেখেছি, আজও দেখলাম। ইনিই কি সে? 'র' সাহেব উনার সম্বন্ধেই কি বলেছিলেন? কি করতে যাচ্ছি আমি জানিনে। উনিও আমার প্রতি আকর্ষিত হচ্ছেন? ফের টিচার্স কমনরুমে এসে সা'দউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। জাফরের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। Award letter নিয়ে এলাম। লাইব্রেরিতে আবার 'র'কে দেখলাম। Martin Luther King-এর একটা লেখা পড়লাম। খুবই ভালো লাগলো। কিং একজন মানুষের মতো মানুষ। রাফায়েল যেমন করে ছবি এঁকেছেন, শেক্সপীয়র যেমন করে নাটক লিখেছেন, তেমনি কল্পনার তীক্ষ্ণতা এবং আবেগের ঘনত্ব দিয়ে আমি যদি ঘরও

ঝাঁট দেই, আমার কথা মানুষের স্মরণ থাকবে। আমি মনের দিকে দিয়ে কিং-দের মতোই মানুষ। এতোকাল হাপিত্যেশ করছিলাম, কোনো বড়ো আদর্শের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারছিলাম না বলেই। খেয়ে আজিমপুর হোসনে আরার কাছে গেলাম সাঈদসহ। ফিরে এসে ঘুমোলাম। একটা সুখদায়ক স্বপ্ন দেখেছি। মনে পড়ছে না। তারপর নিউমার্কেটে যেয়ে কলম এবং তালা-চাবি কিনলাম। হুমায়ুনদের বাড়িতে যেয়ে শামীমদের জন্য দু'শো টাকা ধার করলাম। তারপরে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ড. জগদীশের কক্ষে গেলাম। ফিরে এলাম। 'র'র কথা চিন্তা করছি।

২৩ মার্চ, ১৯৭৩

আজ দিনটিও মন্দ কাটলো না। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেছি। স্নান, তারপর নাস্তা। রাজ্জাক স্যারের বাসা। স্যার বই দিলেন না। কিন্তু 'তুমি' বলে সম্বোধন করলেন। গীতশ্রীকে নিয়ে আর্ট কলেজ। শ্যামাকে দু'শো টাকা দিলাম। আমি লাইব্রেরিতে গেলাম। গীতশ্রী এলো তাকে নিয়ে প্রথমে বাংলা একাডেমী এবং পরে অরুণের অফিসে গেলাম। এসে খেলাম। খেয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করলাম। ভুলে গেছি হুমায়ুনের বাবা এবং সিরাজের চিঠি পেয়েছি। ঘুমোতে পারলাম না। আর্নল্ড টয়েনবির বইখানা পড়তে শুরু করলাম। ভারী চমৎকার বই। সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। তাহেরাকে নিয়ে শ্যামা এলো। তাকে কিছু লোকের নাম দিলাম। শ্যামা সেন্ট্রাল রোডে যেতে চাইলো। আমি যেতে দিলাম না। তাকে আনিসসহ কলেজে দিয়ে এলাম। রেবুর বাড়িতে যেয়ে কলম এবং চিঠি দিয়ে এসেছি। একটা পর্ব চুকে-বুকে গেছে। জগদীশের কাছে যেয়ে এক্সরে প্লেট নিয়েছি। আমার নাকি টিবি হয়েছে। সিগারেট এবং চা একবারেই ছেড়ে দিতে হবে। শরীফ স্যারকে বললাম। কি আশ্চর্য, আমি যক্ষ্মা রোগী। মা এবং ভাইয়ের ছেলেদের জন্যই দুশ্চিন্তা। আমার কোনোও অনুতাপ নেই। যদি মরে যাই মরে যাবো। আমি যেনো কিছুটা স্টোয়িকদের মতো হয়ে গেছি। দুঃখ লাগছে একটা মেয়েকে সাহায্য করবো বলে কথা দিয়েও কিছু করতে পারিনি। সন্ধ্যেয় খুবই ক্লান্তি লাগছিলো। আমার বিশ্রাম প্রয়োজন। আলস্য প্রয়োজন এবং প্রয়োজন মৌনতা। যতোক্ষণ বেঁচে আছি ভালোই আছি।

২৪ মার্চ, ১৯৭৩

টিবি-র রোগীর অনুভূতি নিয়েই আমার ঘুম ভাঙলো। স্নান। নাস্তা। তারপর রিকশা করে রাজ্জাক স্যারের বাসায় গেলাম। যাওয়ার সময় একটা ব্যাপার হয়ে গেলো। নিপার সামনে রিকশাঅলা দাঁড়িয়ে রইলো। জিজ্ঞাস করলে বললো, খালি কলস নিয়ে যেতে দেখেছে, আগে ওটা ভরতি করে আসুক, তারপর যাবো। সত্যি সত্যি সে তাই-ই করলো। নূর মুহম্মদ স্যারকে দিয়ে সই করালাম। রাজ্জাক স্যার সই করলেন। শরীফ

স্যার সই করলেন। বলতে ভুলে গেছি সিরাজ এবং শামসুকে দু'খানা চিঠি লিখেছি। নরেনদা এলেন। জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁকে আমার নামে টেলিগ্রাম করেছেন। ডিপার্টমেন্টে যেয়ে ফরমগুলোতে সীলমোহর দেয়ালাম। নরেনদাকে নিয়ে বাংলা একাডেমী। একটা প্রতিক্রিয়ার দুর্গ তৈরি হচ্ছে সেখানে। নিউ মার্কেটে ঔষধ পেলাম না। এসে খেলাম। ঘুমোবার অবকাশ হলো না। গীতশ্রী এলো। তাকে নিয়ে আনিসের রুমে যেতে হলো। একটা লেখা মুখে মুখে বলে গেলাম। নওয়াব এলো। সে আমার সঙ্গে অত্যন্ত রুঢ় ব্যবহার করলো। অরুণ এলো। তাকে নিয়ে রেবুর ওখানে গেলাম। তিনি ওপরে গিয়ে খবর দিলেন জগদীশ নেই। আমি জগদীশের হোস্টেলে গেলাম। বলতে ভুলে গেছি। শামীমের ভাইকেও আমি দেখতে গেছি। ওরা আমার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেছে তাতে করে আমার রাগ করা উচিত। কিন্তু রাগ করার মতো অবস্থা আমার নেই। ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের হলের নেপালী ভদ্রলোক Steptomycin দিতে স্বীকৃত হলেন। শরীর ভালো নয়। ঘুমুতে যাচ্ছি।

২৫ মার্চ, ১৯৭৩

কি আশ্চর্য ! আমি একটুও ভয় পাচ্ছিনে। আমার টিবি হয়েছে এটা যেনো একটা খুবই মজার খেলা। আমার সমস্ত চেনা-জানা মানুষদের ওপর চাপ দিয়ে কিছু যেনো সুবিধে আদায় করছি। ক্রমশ এটা বুঝতে পারছি, মানুষ রোগের মধ্যদিয়ে নিজের কাছেই ফিরে আসে। আমি মনে মনে খুশিই হয়েছি। কারণ আমার নিজের সমস্ত গোপন পরিকল্পনাগুলো কাজের রূপ দেয়ার মতো এমন অখণ্ড সুযোগ হয়তো জীবনে কোনোদিনই পাবো না। এই সময়ের মধ্যেই আমাকে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে উঠতে হবে। অনেকগুলো পুরোনো অভ্যেস ভুলে যেতে হবে। সেগুলো— ১. ধুমপান; ২. চা; ৩. মিথ্যেকথা; ৪. উগ্রতা। এই চারটি জিনিষ আমি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করবো। নিজের প্রতিটি খুঁটিনাটি এবং প্রতিটি প্রবণতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবো। এই তিনমাস আমাকে সম্পূর্ণভাবে গড়ার সময়। শরীরের ওপর চিকিৎসা চলবে এবং আমি মনকে একাগ্র করে তুলতে শিখবো।

আজ সকালে রোগী হিসেবেই শয্যা ত্যাগ করলাম। গতরাতে ভালো ঘুম হয়নি। কারো সঙ্গে ঘুমোতে আমি পারিনে। নরেনদাকে নিয়ে নাস্তা করলাম। তারপর মাঠে পায়চারি করলাম। 'সোনার চেয়ে দামী' বইটা পড়তে চেষ্টা করেছি। নরেনদার বন্ধু জাহাঙ্গীর সাহেব এলেন। ভদ্রলোককে কেনো জানি পছন্দ হয় না। বড্ডো বেশি আদর্শবাদী, সেন্টিমেন্টাল এবং কাপুরুষ। নরেনদাটা স্থূল। সূক্ষ্মভাবে কোনো কিছু বুঝতে পারেন না, চেষ্টাও করেন না। সে যাক, আমি নিউ মার্কেটে যেয়ে ট্যাবলেট এবং ঔষধগুলো নিয়ে এলাম। ট্যাবলেট খাওয়া আরম্ভ করেছি। ভাত খেয়েছি। তারপর কিছুক্ষণ পড়তে চেষ্টা করে ঘুমিয়ে পড়েছি। প্রায় এক ঘন্টার মতো ঘুমিয়েছি। ঘুম থেকে উঠে চা

খেয়েছি। গীতশ্রী এলো। মেয়েটিকে খ্যাতনাম্নী হওয়ার ভূতে ধরেছে। এটা খারাপ। যদিও খুব বশীভূত আমার। লাই দেইনি। সিগারেট খাওয়া আজ অনেক কমিয়েছি। চার পাঁচটা হবে। অবশ্য ক্যাপস্টেন। আমার মধ্যেও যে মৃত্যু বাসা বেঁধেছে তারও তো একটা শক্তি আছে। সিগারেট, চা এগুলো মৃত্যুর শক্তিরই সহায়তা করে। আমি এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি জীবন এবং মৃত্যু দু'টো থেকে একটাকে আমাকে বেছে নিতে হচ্ছে। এই বেছে নিতে গিয়ে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে হচ্ছে। সে যাক, সন্ধ্যেবেলা জগদীশ এলেন। নওয়াব ও শরীফ স্যার হোস্টেলের সামনে কিছুক্ষণ বসলেন। তিনি একটা খবর দিলেন। কেতাবউদ্দিনের কাছে গেলে মেডিক্যাল রিপোর্টটা পেয়ে যাবো বললেন। ধন্যবাদ।

২৬ মার্চ, ১৯৭৩

রাতে লিখবো মনে করেছিলাম। হয়নি। সারাদিনের লোকজনের আসা-যাওয়ার একটা মিষ্টি আমেজ স্নায়ু মোহিত করে রেখেছিলো। তাই রাতের বেলাতেও দিনলিপি লিখতে পারিনি। ২৭ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে এসে দেখি ডাক্তার এখনো আসেননি। সুতরাং কি করি, গতদিনের ঘটনাগুলো নোট করতে বসেছি। সকালে উঠে মাঠে বেরিয়েছি। সূর্যটা ভারী সুন্দর। এই ধরনের সূর্যকে দেবতাজ্ঞানে আর্যঋষিরা পূজো করতেন। আক্ষরিক অর্থে না হলেও আমার মনোভাব যা হলো পূজোর চাইতে কম নয়। শামীম, নাঈমা, এবং ফরিদা এলো। শামীমটাকে অনেক কমনীয় দেখালো। জগদীশ, ইজাহার এবং নরেনদা এলেন। ওঁরা গল্প করে চলে গেলেন। দুপুরবেলা নরেনদাকে নিয়ে আমাদের ডাইনিং হলে খেলাম। জগদীশও ছিলেন অতিথি। গীতশ্রী এলো। তার কাজটা করে দিতে পারলাম না। সে গান গাইলো। জগদীশটার বোধ হয় একটু ছ্যাঁকা লাগলো। গীতশ্রী চলে গেলো। চন্দনাইশের ফজল এলেন। তারপরে রেবু, সেতু, নওয়াব, হুদা এলো। রেবুর ব্যাপারটি আমার নিজের কাছেও খুব পরিষ্কার নয়। সে এসেছিলো, অকেক্ষণ বসেছিলো। লেখক শিবিরের ব্যাপার নিয়ে নানান আলোচনা হলো। নওয়াবটা মানসিক গুণগুলো বোধ হয় হারিয়ে ফেলছে। ক্রমশ সে কৃত্রিম হয়ে উঠছে। এটা খারাপ। এখন আনিসটা আমার অভিভাবক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে মনে করে, আমাকে কড়া শাসন করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। হাসি পায়। শরীফ স্যারের বাড়িতে যেয়ে ডঃ কেতাবুদ্দীনের কাছে একখানা চিঠি দিয়ে এলাম। রাত দশটার দিকে সাঈদকে নিয়ে শরীফ স্যারের বাড়িতে যেয়ে বেটোফেনের রেকর্ড শুনলাম। মানুষের কণ্ঠের এতো তেজ, এতো লাবণ্য, এতো শক্তি? রাতে এসে ঘুমোলাম।

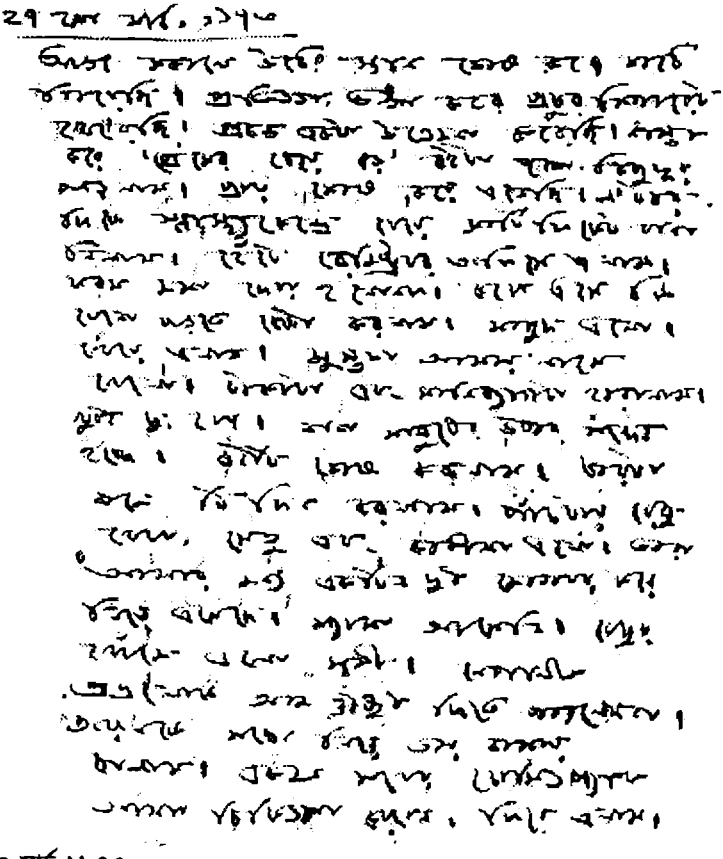

২৭ মার্চ ১৯৭৩

আজ সকালে উঠে স্নান শেষ করে মাঠে গিয়েছি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে প্রচুর সিগারেট খেয়েছি। প্রচণ্ড একটা উত্তেজনা অনুভব করেছি। নাস্তা করে 'প্রেমের চেয়ে বড়' বইটা বেশ কিছুদূর পড়লাম। প্রায় শেষ করে এনেছি। ন'টার দিকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেয়ে সার্টিফিকেটখানা নিলাম। হেঁটে রেজিস্ট্রার অফিসে এলাম। ফরম জমা দেয়া হলো না। কক্ষে এসে কি যেনো পড়তে চেষ্টা করলাম। মাসুদ এলো। খেয়ে এলাম। মুস্তফা আমার নামে খেলো। টাকাটা এবং মানিব্যাগটা হারালাম। খুবই দুঃখের। নানা মানুষের ওপর সন্দেহ হচ্ছে। বইটি শেষ করলাম। চারটা বাজে টিফিন করলাম। পাঁচটায় রেবু, খেয়া, সেতু এবং কাকীমা এলো। তারা আমার জন্য এক টিন দুধ যোগাড় করে নিয়ে এসেছে। শ্যামা আসেনি। রেবুর খোঁজে এলো মসী। নেপালী ভদ্রলোক আজ ঔষধ দিতে পারলেন না। অরুণকে সঙ্গে নিয়ে তার বাসায় গেলাম। একজন সখের হোমিওপ্যাথ আমার চিকিৎসা করবেন, ফিরে এলাম।

২৮ মার্চ, ১৯৭৩

অন্যান্য দিনের চাইতে একটু দেরিতে ঘুম ভাঙলো। মাঠে বেড়ালাম। শরীফ স্যারের সঙ্গে দেখা হলো। এসে গোসল করে নাস্তা করলাম। রাজ্জাক স্যারের বাড়িতে যাওয়া হলো। এসে নরেনদা এবং জগদীশের সঙ্গে দেখা হলো। জগদীশ আমার জন্য ঔষধ এনেছেন। জগদীশ এবং মোস্তফাকে নিয়ে বেরোলাম। টিচার্স কমনরুমে খানিকক্ষণ বসলাম। তারপর রাজ্জাক স্যার এলে তাঁকে দিয়ে দরখাস্ত রেকমেন্ড করিয়ে রেজিস্ট্রার অফিসে দিয়ে এলাম। বাড়ি এসে ধোয়া-মোছা করলাম। জামাল এবং সিরাজের কাছে চিঠি লিখলাম। জামাল আর মীর আহমদের কাছ থেকে চিঠি পেলাম। ইকবাল এবং নরেনদাকে নিয়ে খেলাম। মানবেন্দ্র রায়ের 'নব মানবতাবাদ' বইটা পড়লাম। ঘন্টাদেড়েক ঘুমোলাম। বলতে ভুলে গেছি, নওয়াব এসেছিলো। ঘুম থেকে উঠে চা খেলাম। মিয়াভাই ভানিয়াকে নিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ পর নওয়াব এলো। তারপরে জগদীশ। আমি আর মিয়াভাই ভানিয়াকে নিয়ে রেবুদের বাড়িতে গেলাম। সেখানে দেখি মসী আর তথাকথিত প্রিন্স। নওয়াব আর সাঈদের আসার দেরি হচ্ছে দেখে মেডিক্যাল কলেজের আউট ডোরে যেয়ে প্রথমবারের মতো টিবি ইনজেকশান নিয়ে এলাম। বিস্মিত হয়েছিলাম। শরীফ স্যারের ছেলে রিজভী এসেছিলো। তাকে ফেরত পাঠাতে হয়েছে। ইনজেকশান নিয়ে ফিরে এসে দেখি হুমায়ূন, কাকীমা এবং ইকবাল আমাকে দেখতে এসেছেন। নওয়াব, হুমায়ূন, আনিসদের ছেড়ে আমি, মিয়াভাই এবং সাঈদ প্রেসে গেলাম। প্রসঙ্গের বিজ্ঞাপনটা ছাপতে দিয়ে এলাম। কাল প্রুফ দেবে। সাবদার সিদ্দিকীকে বেফাঁস ঘোষণার জন্য মুজিববাদীরা মেরেছে। আশ্চর্য মানুষ তা সমর্থন করছে! আর শুনলাম, মেডিক্যাল হাসপাতালে একজন পিস্তল দেখিয়েছিলো। জনতা তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। হাসপাতালে দেখলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে বেড়ায় পাগল ছেলেটা মাথাটা ফাটিয়ে ফাস্ট-এইড চাইতে গেছে। প্রেস থেকে ঘরে এসে দেখি চাবিটা আনিনি। আবার প্রেসে যেয়ে চাবি সংগ্রহ করে আনতে হলো। এসে খেলাম।

২৮ শে মার্চ, ১৯৭৬

[illegible]

২৯ মার্চ, ১৯৭৩

আগের রাতে ভালো ঘুম হয়নি। তাই আজ সকালবেলা বেড়ানোটা বন্ধ থাকলো। নরেনদা আমাকে বিছানায় রেখেই চলে গেছে। কাকস্নান করে নাস্তা করলাম। শামীমের বাবা এলেন। ভদ্রলোককে খুবই বিব্রত মনে হলো। আশা করেছিলাম, শামীম আসবে, এলো না। মানবেন্দ্রনাথের বইটি শেষ করে শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনের দিকে গেলাম। কিছুক্ষণ লাইব্রেরিতে থাকলাম। ভালো লাগলো না। পড়াশোনায় মন বসলো না। এসে খেলাম। সিগারেট খাওয়া এখনো সমানে চলছে। সিরাজের কাছে চিঠি লিখলাম। একটু ঘুমোলাম। ঘুম থেকে জেগে 'The Nabobs' বইটা কিছুদূর পড়লাম। রেবু বা ওবাসার কেউ আসবে বলে ধরে নিয়েছিলাম। কেউ এলো না। আমি এমন হতভাগ্য যে প্রয়োজনের সময় কাউকে পাইনে। জগদীশ এলেন। তিনি একটা কাজের কথা বললেন, করতে পারবো কিনা জানিনে। মুস্তফার সঙ্গে নীলক্ষেত রেল গেটে যেয়ে ইনজেকশান নিয়ে এলাম। আমার একজন প্রিয়তমা মহিলা চাই। সে কি শামীম? না...

অনেকক্ষণ মাঠে মুস্তফাকে নিয়ে ঘুরলাম। হুমায়ূনের মামা এবং নানাজীর সঙ্গে দেখা হলো। তাঁরা আমাকে দেখতে এসেছিলেন। মুস্তফাকে খাওয়ালাম। আগামীকাল টি.সি.বি. অফিসে যাওয়ার জন্য একটা সভা করলাম। আনিস শামীম সম্বন্ধে একটা বিশ্রী ইঙ্গিত করলো। কতোকাল ধরে এ রকম বিশ্রী কথা শুনতে হবে কে জানে। আজকে শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ।

৩০ মার্চ, ১৯৭৩

সকালে ঘুম থেকে উঠতে বিলম্ব হলো। তাই বেড়াতে যাওয়াটা হলো না। স্নান এবং নাস্তা করলাম। 'The Nabobs' বইটা কিছুদূর পড়তে চেষ্টা করলাম। জগদীশ হালদার বেড়াতে এলেন। তাঁর জন্য বোধহয় কিছু করতে পারবো না। টি.সি.বি.-র চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করলাম। ফরিদা এবং নাঈমা এলো।

দুপুরে খেয়ে টি.সি.বি.-তে কাপড়ের চেষ্টা করতে গেলাম। কাপড় দিলো না। অত্যন্ত ক্লান্ত এবং বিরক্ত হয়ে চলে আসতে হলো। কাপড় না পাওয়াটা বড়ো নয়, অপমানটাই মুখ্য।

রেবু এবং নওয়াব এলো। রেবুর মুখটা খুবই শুকনো। নওয়াবকে একটু বকাবকি করলাম। কিছুক্ষণ পর মুস্তফা, আমি, আনিস এবং সাইদুর রহমানসহ শাহীন প্রেসে গিয়েছিলাম। বিজ্ঞাপনের ফরমটা আজো ছাপা হয়নি। আগামীকাল হতে পারে।

রাতে এসে খেলাম। এ হোস্টেলের অনেকের সঙ্গে খাতির হলো। কিছুই পড়তে পারিনি। ভারী অনুতাপ হচ্ছে। বেড়ালদের মা ছেলে সবাইকে দুধ খাওয়ালাম।

৩১ মার্চ, ১৯৭৩

মতিনউদ্দীন সাহেব ঘুম ভাঙালেন। কিছুক্ষণ মাঠে পায়চারি। স্নান, শেভ এবং নাস্তা। বাংলা একাডমীর বৃত্তিটা ছেড়ে দেয়ার চিঠিটা লিখলাম। এরই মধ্যে এলেন জগদীশ। তারপর ফরিদা এবং বেবী। গণকণ্ঠ থেকে এলেন আসাফউদ্দৌলা। মেয়েদের কার্ডগুলো বিলোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। বাংলা একাডেমীতে যেয়ে বৃত্তির চেক নিয়েছি। পদত্যাগপত্র দাখিল করেছি এবং সেলিনাকে চেক জমা দিতে এবং প্যান্টের কাপড় দিতে বলেছি। সেক্রেটারিয়েটে যেতে চেষ্টা করেছি, পারিনি। ফিরে এলাম। রেজিস্ট্রার অফিসে গেলাম। বারমাসের বৃত্তি পাওয়া যাবে না। যাক, ট্যাবলেট আনতে গেলাম। এসে খেয়ে ঘুমোলাম। একটু পরে জগদীশ এলেন। জগদীশসহ মফিজ চৌধুরীর বাড়ি। তাঁর কাজটা বোধহয় হয়ে যেতে পারে। ড. চৌধুরীর বাড়ি যাওয়া ঠিক করলাম। ফিরে এসে দেখি অরুণ, ভানিয়া, রেবু এবং কাকীমা। পরে ইনজেকশান নিলাম। খুবই ব্যথা পেলাম। রেবুটা দিনে দিনে পাথর হয়ে যাচ্ছে। ওর দিকে তাকালে দুঃখে আমার বুকটা ভেঙে যেতে চায়। তার ছেলেমেয়েগুলোকে কি যে ভালো লাগে! আমি এবং অরুণ শাহীন প্রেসে যেয়ে 'প্রসঙ্গের' বিজ্ঞাপনগুলো নিয়ে এসেছি। একটা দিন একটা মাস করে আমার জীবন ফুরোচ্ছে।

১ এপ্রিল, ৭৩

আজও মতিনউদ্দীন সাহেব ঘুম ভাঙালেন। অনেকক্ষণ ভ্রমণ, স্নান, নাস্তা। তারপরে পড়তে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। রেবুদের বাড়িতে গেলাম। পথে ইনজেকশন দেয় মানুষটির দেখা হলো। ট্যাবলেট দিলেন। রেবুদের বাসায় বসে থাকতে হলো। রেবুকে এবং তার ছেলেমেয়ে তিনটিকে কি যে ভালো লাগলো! নওয়াব, মনোয়ারুদ্দীন, মুস্তফা, আনিস এবং সাঈদ এলো। প্রায় এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথা বললাম। এখনো লেখক শিবিরের কোনো working philosophy দাঁড় করাতে পারলাম না। একটা না একটা দ্বৈতবাদ থেকে যাচ্ছে। আলোচনা ঘনত্ব করতে পারছে না। সে যা হোক, গণকণ্ঠ বন্ধ করে দেয়ার ব্যাপারে প্রতিবাদ করে ইংরেজি, বাংলা দু'খানি প্রতিবাদলিপি ডিকটেশন দিলাম। দুপুরে খেয়ে ঘুমোলাম। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। আনিস ডেকে তুলেছে। চা খেলাম। ওরা শ্যামাদের চিত্র প্রদর্শনী দেখতে গেলো। আমিও গেলাম। শ্যামা মেয়েটির যে চিত্রকলায় প্রাথমিক জ্ঞানটুকু নেই সে ব্যাপারে নিজেই জানে না— এটাই আশ্চর্যের। ফরিদার কাজ ভালো হয়েছে। নাইমা চলনসই। অধ্যাপক স্বপন আদনানের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁকে নিয়ে এসে অনেকক্ষণ হলের লনে বসলাম। নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হলো। একটা চিন্তা-ভাবনা করার মতো পাটাতনের অস্তিত্ব বোধ হয় ভেতর দিক থেকে ভেসে উঠছে। স্থির হয়েছে আগামী রোববারে সাঈদের কক্ষে আমাদের আলোচনা সভা বসবে। আজকের বিকেলটা খুবই নিরানন্দ কেটেছে। কার্ল মার্কস পড়া প্রায় শেষ।

২ এপ্রিল, ১৯৭৩

আজকেও মতিনউদ্দিন সাহেব ঘুম ভাঙালেন। অল্পক্ষণ মাঠে পায়চারি। শেভ, স্নান এবং নাস্তা। তারপরে ঘুম। উঠে ব্যাংক থেকে তিনশো আশি টাকা উঠালাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিসে একবার গেলাম। আজ নিয়োগপত্র পাঠানো হবে। প্যান্টের কাপড়, ক্ষুর, ভানিয়ার রঙের বাক্স এবং 'বাঙলার কাব্য' ও 'মার্কসবাদ' বই দু'টো কিনলাম। কাপড় সেলাই করতে দিয়ে এসে খেলাম।

দুপুরে নওয়াব এলো। তাকে এবং সাঈদকে বাংলাবাজারে প্রকাশ ভবনে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাঠানো হলো। হক সাহেবের কাছে কার্ল মার্কসের জীবনীখানাও পাঠানো হলো। কি জানি কি হয়। মুশাররফকে জুতোর হাফশোল, জামা মেরামত এবং ক্ষুর শানাবার জন্য দশ টাকা দিলাম। রেবুর জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করলাম। ভানিয়াও এলো না।

বিকেলে যে কি খারাপ লাগছিলো। আজ লেখক শিবিরের প্রতিবাদটা দৈনিক বাংলা, সংবাদ, জনপদ এবং People পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শরীফ স্যার ইদ্রিস আলী সাহেবেকে দেখে ফেরত যাওয়ার পথে একটু এলেন। ইনজেকশন দেয়ার লোকটি এলো। তাঁকে ত্রিশ টাকা দিলাম। রেবুদের বাড়িতে যেয়ে রঙের বাক্সটা দিয়ে এলাম। খেয়ে ঘুম পাচ্ছে।

৩ এপ্রিল, ১৯৭৩

সকালে ঘুম ভাঙলো একটু দেরিতে। সামান্য হেঁটে এলাম। স্নান, দাড়ি কামানো, টিফিন। ইনজেকশন নিলাম। শুয়ে থাকলাম। ঘুম এলো না। হুমায়ূনের মামা এলেন। সোহরাব হোসেনের ওখানে যাওয়া থেকে বেঁচে গেলাম। বদলে যেতে হবে গফুর সাহেবের বাসায়। শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনে হুমায়ূনের সঙ্গে দেখা। বাংলা একাডেমীর সেলিনার কাছ থেকে deposit বইটা ফেরত আনলাম। অনীক কিনলাম। এসে খেলাম এবং ঘুমুতে চেষ্টা করলাম। ঘুম বিশেষ হলো না। পড়তে চেষ্টা করলাম। আনিস, সাঈদ এবং কামাল হোসেন সাহেব এলেন। আবার দরজির কাছে গেলাম। কাপড় হয়নি। দুপুরে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। আবার গেলাম। প্যান্ট নিয়ে এলাম। জুতোটা পাওয়া গেলো। অনেকক্ষণ পড়তে চেষ্টা করেও মন বসাতে পারলাম না। তরুকে নিয়ে যে গল্পটা লেখার পরিকল্পনা করেছি তার আঙ্গিকটা মনে মনে স্থির করেছি। দুয়েক দিনের মধ্যেই আরম্ভ করতে পারবো বলে মনে হচ্ছে। সন্ধ্যেবেলা জগদীশ এলেন এবং হুমায়ূনের মামা। মামাকে নিয়ে বনানী। প্রথমে গফুর সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়নি। মামার ভাবীশ্বশুরের বাড়িতে গেলাম। লোকটিকে আমার একটুকুও পছন্দ হয়নি। যাহোক, গফুর সাহেবকে পাওয়া গেলো। তিনি কথা দিলেন। দেখা যাক কি হয়। অধিক রাতে ফিরে এলাম।

৪ এপ্রিল, ৭৩

আজ প্রায় ন'টার সময় ঘুম ভাঙলো। কোনো রকমে নাস্তাটা করলাম। এক রকম অবসাদে শরীরটা জড়িয়ে যাচ্ছিলো। সোজা ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রায় দশটায় জেগে দেখি গীতশ্রী বসে আছে। মেয়েটির দুঃখের কথা শুনলাম। এরপরে মেয়েটি কেমন করে মুখ দেখাবে, ভারী কষ্ট লাগলো।

আজ সব বন্ধ জানতাম না। রেবুদের বাড়িতে গেলাম। নওয়াবের দেখা হলো। ভানিয়াকে নিয়ে ছবি আঁকার চেষ্টা করা হলো। অবশ্য আনাড়ির চেষ্টা। রেবুর ওখানে খেলাম। খুব ভালো খেলাম। খেয়ে এমন সন্তুষ্ট কোনোদিন হইনি। নওয়াবকে আমার ঘরে পাঠালাম।

এসে ঘুমোলাম। নওয়াবকে বাংলাবাজার পাঠালাম। পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠলাম। নিউ মার্কেট থেকে শিক এবং টিকিয়া কাবাব খেয়ে এলাম। ফজলু ভাই আর তার মেয়ে এলো। অনেকক্ষণ গল্পগাছা করলাম। আমার অসুখ যেনো সেরে যাচ্ছে। লিখতে ভুলে গেছি। আজ বাড়ির চিঠি পেয়েছি। সকলে আমাকে বিয়ে করতে বলছে। কিন্তু আমাকে বিয়ে করবে কে? আমার কি আছে?

৫ এপ্রিল, ১৯৭৩

মতিন সাহেবের ডাকে ঘুম ভাঙলো। আজ সকাল বেলার বেড়ানোটা হলো। স্নান, শেভ নাস্তা। ঘুমোবার চেষ্টা। শ্যামার কাছে যাবার কাঁচা ইচ্ছে হলো। গেলাম না। তার মামাসহ হুমায়ূন এলো। জগদীশ ঔষধ নিয়ে এলো। গোটাদিন পায়খানা হয়নি। লাইব্রেরিতে যেয়ে দু'টো বই আনলাম। সমরেশ বসুর 'জগদ্দল' এবং টলস্টয়ের 'What then we must do?' ভুলে গেছি। সকালে রেবুদের বাড়িতে চিঠি দিয়ে এসেছি। মাসুক এবং বাংলাদেশ বেতারের শামসুল ইসলাম এসছিলো। ক্রমশ যে ঝিমিয়ে পড়েছি বুঝতে পারছি। খেয়ে ঘুমোলাম। পাঁচটায় ঘুম ভাঙলো। নতুন কিছু নেই। যথা পূর্বিং তথা পরং। শ্যামলালজী তাদের আশঙ্কার কথা জানালেন। টি.বি. রোগীর স্পর্শকে সকলের ভয়। সকালে নওয়াব এসেছিলো। তাকে আমার deposit বইটা দিয়েছি প্রকাশ ভবনের cheque জমা দেয়ার জন্য। মঞ্জুকে নিয়ে সাইয়ীদ আতিকুল্লাহ্‌র গল্পগুলো কপি করার কথা। কি জানি কপি করেছে কিনা। হুমায়ূনের মামাকেসহ শরীফ সাহেবের বাসায় যেয়ে টেলিফোন করলাম। তার আগে ইনজেকশান নিয়েছি এবং নিউ মার্কেটে যেয়ে শিক কাবাব খেয়েছি। বেড়ালটাকে বের করে দিয়েছি।

১৪ এপ্রিল, ৭৩

আজ সকালে উঠেই রেবুদের বাড়ি যেয়ে চাবি দিয়ে এলাম। এসে গোসল করে কাপড় পরতে না পরতেই রেবু হাজির। তাকে নিয়ে পিজি হাসপাতাল। সোনিয়া মেয়েটির অপারেশন হলো। তখন রেবুকে কেমন যে দেখাচ্ছিলো। কাকীমাকে বাসায় পৌঁছে দিলাম। রওনক জাহান ম্যাডামের সঙ্গে কাগজ সংক্রান্ত ব্যাপারে কথাবার্তা বললাম। এসে হোসনে আরা এবং সিরাজের চিঠি পেলাম। প্রচণ্ডতম আঘাতে যেনো জেগে উঠলাম। তারা উপোস করছে, আমাদের জমি পরের হাতে। দুধের বাচ্চা। দুপুরে ঘুমুতে পারলাম না। আল্লাহ আমাকে ক্ষমতা দাও যেনো ছেলেদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো যোগ্য করে দিতে পারি। আল্লাহ আমাকে ক্ষমতা দাও, সমস্ত দুঃখ, সমস্ত কষ্ট সহ্য করবো। আমাকে পাথর করো এবং ফুলের মতো কোমল করো। আমি যেনো সমস্ত প্রলোভন জয় করতে পারি। শরীফ স্যারের বাসায় সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং জনাব মনিরুজ্জামান মিয়ার সঙ্গে দেখা করে বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের ওপর হামলার প্রতিবাদে কাগজে বিবৃতি দেয়ার ব্যবস্থা এক রকম করলাম। এসে ইনজেকশান নিলাম। সিরাজ এবং জাফরের কাছে দু'খানা ঠিঠি লিখলাম। আগামীকাল থেকে সিগারেট ছেড়ে দেবো। আজ ৩০শে চৈত্র।

২ আগস্ট, ৭৩

অনেকদিন পর ডায়েরি লিখতে বসেছি। এতোদিন কি করেছি নিজেও বলতে পারবো না। জীবনটা নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়। খুব ঘন বনের অন্তরালের ছোটো পাহাড়ী নদীর মতো আমার ঢাকার বর্তমানের জীবন। সেই একঘেঁয়েমী। নানান তুচ্ছতার মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন। সেই রাগ, সেই অভিমান, ঘৃণা, ক্ষোভ, লোভ এবং রিরংসা পেরিয়ে কোনো মতে হৃদি জাগানিয়া বোধের সমীপবর্তী বোধ হয় এ জীবনে হতে পারবো না। জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে কোনো আধ্যাত্মিক শক্তির আকর্ষণ আছে কি? বিশ্বাস করতে পারিনে সংশয় ঘোর হয়ে আসে। অবিশ্বাস করা আরো অসম্ভব। এমন অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করেছি অদৃশ্য হাতের প্রভাব চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। সেই শক্তি কি আমাকে নিয়ে খেলা করছে? না আমি নিজেরই অজ্ঞতা প্রসূত শতমুখী পরস্পর বিরাধী ইচ্ছার জালে জড়িয়ে পড়েছি? কি করে বলবো?

মানুষ কি নিজের অতীত অস্বীকার করতে পারে? তাহলে জীবনের প্রগতি কোথায়? এই জীবনকে নিয়ে আমি কি করবো? বারেবারে মনে হয়েছে এই নারীই সব। কিন্তু পরে দেখেছি মরীচিকা। নারীরা নারীই, সঙ্গের সাথী, দুঃখের বন্ধু এবং আদর্শের অনুসারী নয়। ভাগ্যকে ধন্যবাদ। সু-র গণ্ডিটা পার হয়ে চলে আসতে পেরেছি। এক সময় মেয়েটার নির্বাক মমতা কি তীক্ষ্ণভাবেই না আকর্ষণ করতো। এখন কি করে না? যদি বলি 'না' মিথ্যে বলবো, যদি হলি 'হাঁ' সত্য বলবো না। আমি তার আওতা ছাড়িয়ে আসতে পেরেছি, সেজন্য মনে মনে আনন্দ অনুভব করি। যতো সহজে মেয়েটাকে

পেতে পারতাম, অথচ হেলা করে ফেলে এসেছি। অন্য লোকের হতে যাচ্ছে দেখে এখন ঈর্ষিত হচ্ছি। কোনো কারণ নেই। মানুষের জীবন বোধ হয় এ-রকম।

শ্যামার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি আমি জানিনে। সে মেয়ে নয়, মেয়ের ক্যারিকেচার। 'র'-র সঙ্গে আমার পরিচয়টা বেশ কিছুদূর গড়িয়েছে। এ পর্যন্ত তিনি দু'বার আমাকে স্পর্শ করেছেন। কাল তাঁর ভাইটির জন্য প্রচণ্ড স্নেহবোধ করেছি এবং ছেলেটিকে ভারী ভালো মনে হয়েছে। আর কোনো লোকের ভাইকে এতো ভালো মনে হয়নি। দু'তিন দিন আগে 'র'-র রোগা, ক্লান্ত মুখমণ্ডল এবং অনুচ্চ স্বর তরুর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। ক্রমাগত অনেকদিন তাঁর কথা চিন্তা করেছি। যতোই দেখি দেখার ইচ্ছা তীব্র হয়। কি করবো আমি জানিনে। তিনি যদি নিজে থেকে না এগিয়ে আসেন, আমার এগুবার উপায় নেই। অন্যান্যদের মতো সহজ হতে পারছিনে। গেলে মনে হয় কিছু একটা জামার তলায় লুকিয়ে রেখেছি। কেউ যদি দেখে ফেলে লজ্জার সীমা থাকবে না। সে বস্তুটি কি ভালোবাসা?

আগুন নিয়ে খেলছি। যদি অন্যথা হয় অপমানের একশেষ। কি করে যে নিজের মনকে প্রবোধ দেই। এমন অস্বাভাবিক ঘটনাও ঘটে মানুষের জীবনে? কিন্তু আমি ঘটিয়েছি।

১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩

আজ প্রায় দেড়মাস পরে আবার লিখছি। লিখতে হচ্ছে। বেশ ক'দিন আগে শামীমের মাধ্যমে সুরাইয়া খানমের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। মহিলার নামে অজস্র অপবাদ। একশো পুরুষের সঙ্গে তাঁর নাকি খাতির। এসব কথা এখন হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। এ জাতীয় খারাপ বলে কথিত মহিলাদের প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ রয়েছে। হুমায়ুনের স্মৃতি পুরস্কারের চাঁদা তুলতে যেয়ে বাংলা একাডেমীতে এই অনুপম সুন্দর মহিলাকে দেখি। তাঁকে বোধ হয় খোঁচা দিয়ে কথা বলেছিলাম। সে যাক, মহিলা দু'দুবার শামীমসহ আমার এখানে এসেছিলেন। একবেলা খেয়েছিলেন। দু'বার শামীমের হোস্টেলে ডেকে নিয়েছিলেন। টুকরো টুকরো কথাবার্তা হয়েছে। গতকাল মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম, যেনো আমার উপযুক্ত কোনো মহিলার সঙ্গে দেখা হয়। ঠিক তিনটের দিকে সুরাইয়া এসে উপস্থিত। গোটাদিন অভুক্ত। ভদ্রমহিলা দৈনিক বাংলার শাহাদাত চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোককে চড় লাগিয়ে দিয়ে এসেছেন। আমার মনে হলো তিনি আমার সঙ্গে অত্যন্ত পক্ষপাতের সুরে কথা কইলেন। প্রকারান্তরে বললেন, কাউকে বিয়ে করতে চান। বিগত স্বামীর দোষ বললেন। তাঁকে আমি শামীমের হোস্টেল অবধি দিয়ে এলাম। যেতে যেতে 'War And Peace'-এর সেই যে আঁদ্রের মৃত্যুর দৃশ্যটার কথা বললেন, জীবনে আমি ভুলবো না। ভদ্রমহিলা চরিত্রহীন হোন, মাথা খারাপ হোন তাঁর প্রতি সুগভীর আকর্ষণ বোধ করছি। 'র' কি আমার জীবন থেকে বাতিল হয়ে গেলো? কি জানি। তার সাথে কাল কবীর চৌধুরীর বাড়িতে যাওয়ার কথা। আসবেন কিনা কে জানে।

আজ সকালে মফিজ চৌধুরীর বাড়ি গিয়েছি। কাজ হয়নি। সেখান থেকে সোজা বোর্ড অফিস। সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছি। দুপুরে এসে ঘুমিয়েছি। ঘুম ভাঙ্গার পর 'গান্ধী চরিত' পড়ে শেষ করলাম। খুব বৃষ্টি হয়েছে। আর্ট কলেজে কামরুল হাসানের প্রদর্শনী দেখতে গেলাম। ভদ্রলোকের ছবিতে বিস্তর মাংস-প্রাণ যেনো অনুপস্থিত। তারপর নিউ মার্কেট। 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' কিনলাম ধারে। কবীর স্যারের বাড়িতে টেলিফোন করে চলে এলাম। দুপুরের ব্রত ভেঙ্গেছি। মাছ খেয়েছি। বিকেলে নিরামিষ। আজ মাত্র তিনকাপ চা খেয়েছি। সুরাইয়ার কথা চিন্তা করেছি।

১৯ এপ্রিল, ১৯৭৪

শেষবার লিখেছিলাম গত বছরের ১৫ই সেপ্টেম্বর। তারপর অনেকদিন কিছুই লিখিনি। এরই মধ্যে অনেক অনেক ঘটনা ঘটেছে, অথচ আমি লিখিনি। সময় তো আর কম গেলো না।

আজ খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেছি। কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল ২য় খণ্ড' নিয়ে লদকা লদকি করছি দু'দিন থেকে। কঠিন কিছুই নয়, কিন্তু আঙ্কিক পদ্ধতিতে চিন্তা করতে একেবারে অনভ্যস্ত। সেটিই সমস্যা।

'র' এখন মানসক্ষেত্রে মৃগীর মতো চরে বেড়াচ্ছে। এটা একটা উদ্ভট ব্যাপার। মজার কথা হলো সেও জানে এটা। অনুভূতিটা অবচেতন থেকে উঠে এসে একটা পরিচ্ছন্ন এবং স্পষ্ট প্রকাশ পথ সন্ধান করছে। ভালো কি খারাপ করছি জানিনে। তাকে যে রকম সন্দেহ করি, সেও কি আমাকে সন্দেহ করে না? সত্যি সত্যি কি আমি একজন শত্রুর প্রেমে পড়েছি। আমি প্রেমে পড়েছি, আমি প্রেমে পড়েছি— যদি এভাবে চলে কেউ জানবে না, কেউ জানতে পারবে না।

আজ সিরাজ এবং শামসুকে চিঠি লিখেছি। টিকিটের অভাবে পাঠাতে পারিনি। শামীমের ওখানে যেয়ে পাইনি। মাসুকসহ স্টান্ডার্ডে যেয়ে অনেকগুলো বই কিললাম। জাসদ অফিসে এলাম। কেরালার ছেলে ভাস্করণ সঙ্গে ছিলো। বাসায় এলাম। প্রচণ্ড ক্ষুধায় খাবার খেলাম।

২৩ আগস্ট, ৭৭

অনেকদিন পূর্বেই ধারণাটি এসেছে। একবার শুরুও করেছিলাম। বিশেষ এগুতে পারিনি। 'দিনলিপি' নাম দিয়ে সোনার জলে ছাপানো একখানি নোট বই বাঁধিয়েছিলাম। হাতে নিয়ে সকলে দেখতে চাইতো—এমন একখানি খাতা। কিন্তু আট দশটি পৃষ্ঠার অধিক পূরণ করা আমাকে দিয়ে সম্ভব হয়নি এক বছরে। যা লিখেছি তাতে সত্যের অংশ অল্প না হলেও আস্ফালন অতিশয় অধিক। কেউ যদি পড়ে দেখে মানসক্ষেত্র কর্ষণের একটা অস্পষ্ট এবং ঝাপসা ছবি পেতেও পারে। এইবার গ্যয়টে

জীবনী পাঠ করতে যেয়ে খুব গভীরভাবে অনুভব করছিলাম, আমারও কিছু কিছু অনুভূতি লিখে রাখা উচিত। ক্রমাগতই মনে হচ্ছে আমি অতিশয় বিরাট একটা মানুষ। এটা একটা সরল সহজ অনুভূতি। এতে কষ্ট কল্পনার বাষ্পটুকুও নেই। আমার সমসাময়িক কোনো লেখক কবির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির দিক দিয়ে আমি কারো মতোন নই। অতীতের মানুষেরাই যেনো আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো রচনায় আমার মন বসে না। ক'দিন আগে রবীন্দ্রনাথকে স্বপ্ন দেখেছি। সুন্দর সুঠাম গ্রীক ভাস্কর্যের মতো উন্নত দর্শন। উনিশশো একাত্তুর সালের ২৩শে মার্চ তারিখে আরেকবার তাঁকে দেখেছিলাম। সেবারে ছিলেন বৃদ্ধ সৌম্য দর্শন, এবারে তরুণ, দীপ্ত। তারপরে ক'দিন আমার আবেশের মধ্যে কেটেছে। শুধু ঘুমোবার সময় আক্ষেপ করেছি, আহা আরেকটি দিন খসে গেলো। আজকাল এভাবে আমার সময় যাচ্ছে। আফসোস লাগলেও মনের গভীরে একটা ভরসার ক্ষেত্র যেনো দেখতে পাচ্ছি। আমি বটের শিশু। প্রকৃতি আমাকে মহীরুহ না করে কিছুতেই রেহাই দেবেন না। আমার অকলঙ্ক সহজ বিশ্বাস কোথাও লাঞ্ছিত হয়নি এ পর্যন্ত। সামনের প্রকৃতি আমার বিশ্বাসকে যথোচিত পুরস্কারে সম্মানিত করবেন, সে জাতীয় একটা ইচ্ছা রাখবো না কেনো? যদি আমি সত্যি সত্যি কোনোদিন একজন স্মরণযোগ্য মানুষ হিসেবে টিকে যেতে পারি, সেই অনাগত ভবিষ্যতে, আমার মনোলোকের এই আলো-ছায়ার খেলা যা আমি এখন থেকে ধরে রাখবো অক্ষরে অক্ষরে, উত্তরকালে হয়তো তা অল্প-স্বল্প মূল্য ধরতেও পারে। নিজের কাছে মিথ্যে বলা যায় না। সেই রকম একটা আকাঙ্ক্ষা অনেক দিনে আমার মনে পেকে উঠেছে। গেলো রাতে গ্যয়টের জীবনী পাঠ করার সময়, একটা খাতা কেনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলাম। আমার সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য বিষয় হলো শুদ্ধচিত্তে আমি যা ভাবি তাই-ই ঘটে যায়। চিন্তাটা যতো স্বচ্ছ হচ্ছে এ অলৌকিকতা ততো বেশি সত্য হচ্ছে। আজকে বন্ধু কুমার শংকর হাজরা এসে বলা নেই, কওয়া নেই এই খেরো বাঁধানো খাতাটি কিনে দিলেন কবিতা লেখার জন্য। আমি প্রকৃতির প্রতি আরেকবার কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। এখন থেকে সময়ে সময়ে কিছু কিছু লিখবো। এলোমেলো ভাবনা, হঠাৎ জাগা অনুভূতি, যখন যা মনে আসে। দীর্ঘায়ু না পাক, অন্তত নিজের কাছে নিজের একটা কৈফিয়ত অন্তত রেখে যেতে চেষ্টা করবো।

২৪ আগস্ট, ৭৭

ভারী অসহায় অনুভব করছি। একটু চিন্তা করার পরে মনের ভেতর এ অসহায়ত্বের একটা সংজ্ঞা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। যাতে করে আমি নিজের কাছে নিজে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারি। আসলে আমার ভেতরে বিশুদ্ধতার একটা ভাবকল্প ফুলের মতো ফুটেছে। এ সেই পরশ বস্তু, যার প্রসাদে ভূমণ্ডলের যাবতীয় তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী বস্তু আয়ুষ্মান হয়ে উঠে। আগে এই বোধ ছিলো হাওয়ার মতো হালকা ফিনফিনে। কিছুদিন থেকে গাঢ় শক্ত হয়ে জমাট বাঁধতে লেগেছে। এই একই প্রক্রিয়ায় বোধ করি কিশোরীর

বুকে দুধ জমে। এর যেমন আনন্দ তেমন বেদনা। সমস্ত পৃথিবী ফাঁকা অগভীর এবং মানুষগুলো বাচাল মনে হয়। নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় করে, অথচ নিজের ভেতরে ছাড়া আকাশ পৃথিবীর কোথাও ভরসা পাওয়ার উপায় নেই। নিজের কাছে তাই বারবার ফিরে আসতে হচ্ছে। সবকিছু টলে যাচ্ছে, ভেঙ্গে যাচ্ছে। গোটা পৃথিবী, মানবসমাজ, গাছ-পালা সমস্ত প্রাণবান বস্তু রসাতলের অভিমুখে ছুটে চলেছে। আমার কাঁধে ট্র্যাজিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, এই রসাতলে যাত্রার পথে শক্ত বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে হবে। আমার নিজের ভেতরে তরঙ্গিত প্রাণ রয়েছে, যেখান থেকে কণা কণা তুলে এনে তাবত সৃষ্টির শোণিতে, শিরায় নতুন জীবনস্পন্দনের সঞ্চার করতে হবে।

২৫ আগস্ট, ৭৭

আরো একটি দিন চলে গেলো। আজ সারাদিন ঘর থেকে বের হইনি। বাইরে আমার প্রভাব যতোই বিস্তৃত হচ্ছে মানসিক ছটফটানি সে অনুপাতে বাড়ছে। ঘটনাস্রোতে অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়ার জন্যে রক্তে রক্তে ঢেউ খেলে যায়। এখনো যেনো সময় হয়নি। আমার যা প্রয়োজন প্রকৃতি আপনা থেকেই সরবরাহ করে। অনেকগুলো নারীর প্রভাব আমার সৃষ্টিশক্তিকে রুদ্ধ করে রেখেছে। বাস্তবে হয়তো এমন ঘটবে। এই নারীকুলের কেউ আমার সহযাত্রী হবে না। আজকে অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছি। 'Marxism of Jean Paul Sartre' বইটা পড়ছি। প্যাশোনেট লেখা। অর্থনীতি এবং সমাজতত্ত্বের ওপর সরাসরি দখল না থাকায় শর্ত কিংবা তাঁর আলোকে শেষ পর্যন্ত বিষয়টাকে পরিস্ফুট করতে পারেননি। আমার মনে হচ্ছে, এই চিন্তা পদ্ধতির সঙ্গে ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ভারতীয় দর্শন বিশেষের মর্মশাঁসের সঙ্গে বেশ মিল রয়েছে। আজকে সকালে জিনাত আলী এসেছিলো। প্রকারান্তরে বলে দিয়েছিলাম, কমিশনার নির্বাচনে তার পরাজয় ঘটবে। ঘটলোও তাই। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল যতো তাড়াতাড়ি অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো, ততো তাড়াতাড়ি প্রভাব হারাচ্ছে। সবগুলো বোকা, দাম্ভিক। সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করতে এরা জানেই না। হাসান হাফিজ ছেলেটা তার বড়ো ভাইসহ এসেছিলো। অনেকক্ষণ বকলাম। নির্লজ্জ আত্মম্ভরিতা। কেনো যে বকলাম জানিনে। আমার মধ্যে একই সঙ্গে অনেকগুলো মানুষ বাস করছে। একটা কিছু করতে হবে। কিন্তু সেটা কি। মন সারা পৃথিবীকে আলিঙ্গনে বাঁধার জন্য উন্মুখ। চোখের সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে জীবনস্রোত। কিন্তু আমি বসে বসে কিসের প্রতীক্ষা করছি।

২৭ সেপ্টেম্বর, ৭৭

গতদিন জার্মান দূতাবাস থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। জার্মান রাষ্ট্রদূতের পক্ষ থেকে দূতাবাসের দু'নম্বর সচিব আমাকে লিখেছেন আমার অনুবাদ এদেশের সমালোচকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে জেনে তিনি খুবই সন্তুষ্ট। জীবনে এই প্রথমবার এক ঝলক

আলোর দেখা পেলাম। এই সংবাদটি আমার কাছে খুবই তাৎপর্যবহ। নিশ্চয়ই এক শুভক্ষণে আর সবকিছুর থেকে মুখ ফিরিয়ে গ্যয়টেতে নিমগ্ন হয়েছিলাম। এই সাধক পুরুষের আসল চেতনার স্পর্শে ধন্য হয়েছি আমি। মানুষের আত্মার আলোক মানুষের আত্মাতে এসে লাগেই। লোকে নানা কথা বলে। অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ শ্রেণী বৈষম্যের অবসান ঘটলেই সব মানুষ সচেতনতার অধিকারী হবে। খুঁটিয়ে দেখলে ধরা পড়বে এতে একটা খুব মোটা ফাঁকি রয়েছে। সে যাকগে, আমি ভগবান বুদ্ধের সে কথায় বিশ্বাস করি। মনের ময়লা মনের সাবানেই পরিষ্কার করতে হয়। মন দিয়েই মনে আলো জ্বালানো সম্ভব। গ্যয়টের কিছুটা আলো আমার চেতানার ওপর পড়েছে। আমার ছবি, আমার বাঁশিতে, আমার প্রবন্ধে এমনকি মেয়ে মানুষের সঙ্গ সম্বন্ধেও তার ফলশ্রুতি ঘটতে লেগেছে। কার্লাইল গ্যয়টেকে মহাপুরুষ মুহম্মদের চাইতেও বড়ো মনে করেছেন। আমার ধারণা তিনি ভুল করেছেন। কারণ হযরত মুহম্মদ (স:) জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করে নিজস্ব মহিমায় স্থিত করেছেন। আর গ্যয়টে শুধু জীবনের মহিমা কীর্তন করেছেন। Prophetic genious-এর সাথে Poetic genious-এর এখানেই তফাৎ। আমার মনে হয়, কবি গ্যয়টের চরিত্রেই নবী, অবতার হওয়ার সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিলো। কিন্তু তিনি ছিলেন কিছু অংশে চালাক এবং রাজমন্ত্রী। অবতারদের চরিত্রের অসহায়তা কিংবা নীরিহতা তাঁর ছিলো না। তিনি পরিকল্পনা করেই বোকা হওয়ার ফলাফলটা এড়িয়ে যেতে পেরেছেন। এতে করে তাঁর একদিকে লাভ হয়েছে। কিন্তু ঘাটতির দিকও আছে। দুঃখের বিষয় সে বিষয়টি এতো সূক্ষ্ম যে আলোচনা করলে কেউ বোঝবে না। অকলঙ্ক উপলব্ধিতে যে কোমল অনুভূতি সঞ্চারিত হয়, তাইতো সমস্ত জগতের সৃষ্টির কারিকাশক্তি। গ্যয়টের প্রভাব আমার স্বাভাবিক আসন থেকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যাচ্ছে। তেলের মতো চুঁয়ে চুঁয়ে লেখাটির প্রভাব সকলের ওপর পড়ছে। আমার অন্তর্লোকে যে ময়লা সঞ্চিত ছিলো, গ্যয়টের প্রভাবে অনেকখানিই শুভ্র হয়ে এসেছে। আমি অনেকদূর নির্মল সুন্দর হয়ে উঠতে পারছি। সন্ধ্যেয় বালুদের বাসায় বিসমিল্লাহ্ খানের সানাই শুনলাম। ক্রমশ সঙ্গীদের গভীর রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে। হয়তো বেশি দেরি নেই, এমন সুর ও স্বর আমার বাঁশিতেও জাগবে। আমার তো মনে হচ্ছে, হবে। কি জানি। রাতে ব্যারিস্টার আব্দুল হকের বাসায় এলাম। বালুদের ওখানে বাঁশি বাজালাম। জগন্নাথ হলে নরেনবাবুর বাসায় এসে শুনলাম হলের একটা ছাত্র আরেকটা ছাত্রকে একটা মেয়ের ব্যাপারে ছুরি মেরে খুন করেছে। যে ছেলেটি মারা গেছে বেচারির কাল নাকি পরীক্ষা ছিলো। আসলে এটা হৃদয়বিদারক ঘটনা। কিন্তু আমার কোনো ভাবান্তর লাগছে না।

এ জাতীয় ঘটনা যেনো অতি সাধারণ। ঈর্ষা, ঘৃণা, অধিকারবোধের স্বাভাবিক পরিণতি। আজকে কোমল স্বর বাজাবার রহস্যটা জেনে নিলাম।

১ অক্টোবর, ৭৭

দু'দিন আগে ঢাকা বিমানবন্দরে একদল বিমানদস্যু একখানি জাপানি বিমান জোর করে বিমান ক্ষেত্রে নামিয়ে নেয়। এই আকাশদস্যুরা নিজেদের জাপানি লাল ফৌজের সৈন্য বলে পরিচয় দেয়। দু'দিন এই ছিলো শহরের লোকদের প্রধান জল্পনা-কল্পনার বিষয়। দস্যুরা শেষ পর্যন্ত জাপান সরকারের কাছ থেকে ৬ লাখ ডলার মুক্তিপণ এবং তাঁদের ছ'জন বন্ধুর মুক্তি সাধন করতে সক্ষম হন। শেষ পর্যন্ত তারা সফল হতে পারবেন কিনা বলার উপায় নেই। কেননা এরই মধ্যে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে একটা অভ্যুত্থান হয়ে গেছে। কারা এর নায়ক এখনো সঠিক জানা যায়নি। অভ্যুত্থানকারীরা রাতে যথেষ্ট পরিমাণ গোলাগুলি বর্ষণ করেছে। সাড়ে চারটার দিকে গুলির আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙ্গেছে। মেশিনগান এবং রাইফেলের শব্দ বিস্তর শুনেছি। সকালে উঠেই অমার্জিত কণ্ঠের ঘোষণা শোনা গেলো। সেপাইরা শ্রমিক, কৃষক এবং ছাত্রদের সহযোগিতায় ক্ষমতা দখল করেছে। ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। একটু পরেই তাঁদের নেতা ভাষণ দেবেন। সেই ঘোষিত ভাষণ আর দেয়া হয়নি। কারণ এরই মধ্যে এ অভ্যুত্থানকে অনেকটা দমন করে ফেলা হয়েছে। রেডিও কেন্দ্র পুনরায় দখল করা হয়েছে। শুনেছি দশবারো জন মারা গেছে। ক্যান্টনমেন্টে অধিক মানুষ মারা যেতে পারে। বগুড়া, খুলনা, কুমিল্লা জেলায় সামরিক ছাউনিগুলোতে গোলমালের খবর শুনেছি। প্রকৃত অবস্থা কি জানার উপায় নেই। অনেকদিন আগে ফরহাদ এবং হালিমাকে লিখেছিলাম এই কথা। এখন সামনে কি ঘটবে চিন্তা এবং কল্পনা করার উপায় নেই। এই সময়ে 'জাসদ' পার্টিটাই দেশের হাল ধরতে পারতো। কিন্তু যে সকল নেতা বাইরে আছেন তাঁদের না আছে সাহস, বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা। দেশের যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো কিছু ঘটতে পারে। নিজের মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা টেনশন অনুভব করছি। আজ সকাল বেলা ক'জন সাংবাদিক এবং ক'জন অফিসারের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তাদের অক্ষমতা, দায়িত্বহীনতা এবং সম্পূর্ণ রকমের ভাড়াটে মনোভাব দেখে বিস্মিত হয়েছি। এই যে ঘটনা একের পর এক অবলীলায় ঘটে যাচ্ছে তা আমাদের লোকচিত্তে কোনো রকমের সাড়াই জাগাতে পারছে না। যে যাই বলুক, বাংলাদেশের আসল বস্তু বলে যদি কিছু থাকে তা হলো এর আমলাতান্ত্রিক কাঠামো। স্থবির, অনড়, লোভী, হৃদয়হীন এবং বিদেশী শক্তির ক্রীড়নক হওয়ার জন্যে সর্বক্ষণ প্রস্তুত।

২০ অক্টোবর, ৭৭

আজ প্যালেস্টাইনের আবদুল্লাহকে নিয়ে সন্ধ্যে ছ'টার সময় বালুদের বাসায় পূজা (দুর্গা) দেখতে গিয়েছি। সঙ্গে প্যালেস্টাইনের জিহাদ এবং রফিক কায়সারের ছোটো ভাই শফিক ছিলেন। প্রতিমা দেখে আমার মিশ্র রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ঘৃণা এবং আনন্দ। ঘৃণার কারণ এই যে, এই প্রতিমাপূজার কারণেই আমাদের সমাজের

একাংশের মন-মানস এখনো পর্যন্ত বিমূর্ত ধারণা ধারণ করার নির্ভরতা অর্জন করতে পারেনি। আরো অনেকদিন এ অবস্থা চলবে। আনন্দ হয়েছে এ কারণে যে, আমাদের বাঙালি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, মাধুর্য সবটাই এই প্রতিমাগুলোর সামনে দাঁড়ালে শিউরে শিউরে জেগে উঠে। সাহিত্যে তার কিছু উদ্ভাসন ঘটেছে। কিন্তু চিত্রকলা আর ভাস্কর্যে তার কোনো প্রকাশ ঘটেনি। সুলতানের আশ্চর্য ছবিগুলোতেও জীবনপ্রবাহের এই সুনিবিড় দিকটির ছায়াপাত ঘটেনি। জয়নুল আবেদীন, নন্দলাল, যামিনী রায় কেউ এ অতলে প্রবেশ করতে পারেননি। অবলীলায় বাঙালি জীবনের গভীরে অবগাহন করে ছবি আঁকবেন, মূর্তি গড়বেন তেমন শিল্পী জন্মাবেন কবে এদেশে? আজ সকালে সংবাদপত্রে একটা খবর পড়েছি। লেবাননে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মৃত একজন খ্রীস্টান সন্ত একজন যুদ্ধে আহত পঙ্গু ব্যক্তিকে সুস্থ করেছেন। জগতে এখনো আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। বাঁশিটা চারমাস ধরে আমাকে আটকে রেখেছে। কি জানি, শেষ পর্যন্ত কোন বস্তু জন্ম নেয়। ভাগ্য অবশ্যই আমাকে একটা পথ বাতলে দেবে। আজ দুপুরে শয়ন করার সময়ে মনে মনে আমি চিন্তা করেছিলাম, যে-কোনো একটা মহিলা আমার চাই। কারো কথা স্পষ্ট চিন্তা করিনি। ঘুমে যে মেয়েটি এলো, কিশোর পার হওয়ার পরে তার সঙ্গে দেখা হয়নি। প্রায় ভিখারী। তাকে আমি অনুরাগ নিয়ে আলিঙ্গন করেছি স্বপ্নে এবং লাল চোখ দেখে ভয় পেয়েছি। হায়রে মানুষ! হায়রে মানুষের মন! 'হ'-এর সঙ্গে আমার সম্পর্কসূত্র ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। চেষ্টা করেও তার ওখানে যেতে পারছিনে। প্রত্যেক দিনই পরিকল্পনা করি সন্ধ্যেয় যাবো। কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে না। রাজনীতি আবার আমাকে আকর্ষণ করছে। ব্যারিস্টার হককে নিয়ে যে বাংলাদেশভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কর্মসূচি সমন্বিত এবং সম্পূর্ণ বৈদেশিক সম্পর্কহীন একটি সম্মেলন ডাকার কথা চিন্তা করেছি, তা আকার নিচ্ছে। যদি সফল হয় দেশের একটা বড়ো কাজ হবে। মিয়াভাই (সেকান্দর) এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে বাঁশি কেনার জন্য হাইকোর্টে গিয়েছি। বাঁশিঅলা আসেনি। গান শুনেছি। গাঁজাটেদের সঙ্গে আলাপ করেছি।

২৪ জুন, ১৯৭৯

প্রায় দু'বছর গত হলো। এরই মধ্যে নিজের হাতে কলম ধরে কিছু লিখিনি, একমাত্র গান ছাড়া। একটা চিঠিপত্রও না। বলতে গেলে আমি যেনো জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিলাম। আজ মনে হচ্ছে জীবনে আবার ফিরে এসেছি। গান এক রকম শেখা হয়েছে। বাঁশিটা আয়ত্তে এসেছে। সবচাইতে আশ্চর্যের '৬৯ সালে সেপাই বিদ্রোহের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপিটা আবার ফেরত এসেছে। এ মেয়েটি আমার জীবনে বিরাট একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এই প্রথম একটি মেয়ে আপন হাতে গাঁথা মালা আমাকে উপহার দিলো।

আশ্চর্য একটা পরিবর্তন আমার ভেতর এসে গেছে। আমি আবার জীবনে ফিরে চলেছি। এই মেয়েটি আমাকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আবার আমি লিখবো। বাড়ি যাবো।

দুঃখিনী বোনদের খবর নেবো। মা-বাবার কবর জেয়ারত করবো। লিখতে পারছিনে। অনুভূতিতে হাত ভারী হয়ে আসছে।

৫ অক্টোবর, ৭৯

প্রায় পাঁচ মাস। আজকে 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের' শেষ অংশের প্রুফ দেখলাম। গতবার পাণ্ডুলিপিটা পাওয়ার পর লিখেছিলাম। আশ্চর্য গভীর ছন্দ। আজ সকালে অবাক হয়ে লক্ষ্য করি যে সঙ্গীতটা আমার এসে গেছে। মানুষের কানে সংবাদটা যেতে কিছু সময় লাগবে। একই সঙ্গে দেবত্ব এবং পশুত্ব আমাকে আশ্রয় করেছে। আজকেও সে কদর্য কর্দমাক্ত পৃথিবীর মতো মহিলাটি আমাকে গ্রাস করেছে।

দুপুরে স্বপ্ন দেখেছি। এটি খুবই তাপর্যপূর্ণ এবং ইঙ্গিতবহ স্বপ্ন মনে হয়েছে। দেখলাম, বাড়ির পেছনের বাঁকা-কাঠাল গাছটি থেকে একছড়া পাকা কলা পেড়ে ভাবীকে দিলাম। তারপর কাঠাল গাছটির হেলে পড়া অংশ ভেঙ্গে গাছটি সোজা করে দিলাম। ভাবীকে মন্তব্য করতে শুনলাম, আমার এ কাজের ফলে গাছটির এমন পরিবর্তন হলো যে, কেউ মনে করতে পারবে না এর একটি হেলে পড়া অংশ ছিলো। কাণ্ড থেকে গজানো ডালটাকেই মনে হবে গাছের স্বাভাবিক অংশ। পরে আমি দেখলাম, ওটা কাঁঠাল গাছ নয়, বাড়ির পেছনের 'ঘিলা আমের' গাছটি। নামতে একটু অসুবিধা হলো। তবু নেমে গেলাম। আরো দেখলাম, বাড়ির পেছনে আমার হাতে লাগানো 'সিংহনাথ' কলাগাছটিতে একছাড়া কলা পেকে রয়েছে। বাবাকেও দেখলাম।

আমি এভাবে স্বপ্নের অর্থটি করছি। আমার অস্বাভাবিক জীবনের একটা গতি দিয়ে ফেলেছি। আর আমার কাছে অপ্রত্যাশিত কিছু কর্ম লোকসমক্ষে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আমার সাধনা মাটিতে দাঁড়াতে পারছে। যে চাকুরিটা আমি সন্ধান করছি, সেটি স্থির হয়ে রয়েছে। খুব ভারমুক্ত মনে করছি।

২৩ নভেম্বর, ৭৯

আজকে একটু দোদুল্যমান মানসিকতা নিয়ে লিখতে বসেছি। মনে হচ্ছে আমার জীবনের একটা পর্যায় শেষ হলো। অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি, ভেতরে-বাইরে সম্পূর্ণ মুক্ত মানুষ। আমার ভেতর মোহ, লোভ, ভয় এসবের অবশিষ্ট মাত্রও নেই। প্লেটো মিথ্যে বলেননি, সঙ্গীতসাধনা মনুষ্য চরিত্র শুদ্ধির মহত্তম উপায়। এখন বলতে পারি, আমি নিজে একজন সঙ্গীত শিল্পী। এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা। নিজের ভেতরে নিজেকে আবার নতুন করে জন্ম দিলাম। কি আনন্দ! কি বেদনা! কেনো ভাবছি বলতে পারবো না। প্রায় রবীন্দ্রনাথ জাতীয় একজন মানুষ আমি। আজ লিখতে বসার আগে স্থির করেছিলাম রোজীদের বিষয়ে একটা ভুল করেছি সে বিষয়ে লিখবো। কিন্তু কলম চলছে না। হয়তো সিদ্ধান্ত এখনো পাকেনি, নয়তো প্রকৃতির আরো কোনো রহস্য এখনো

অনন্মোচিত আছে। 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' বইটা ক'দিন আগে বের হয়েছে। এটি আমার বাবা, বন্ধু এবং প্রিয়তমার চাইতে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। অথচ এ বইটির সঙ্গে আমার সামান্যতম মানসিক সংযোগও নেই। এখন বুঝতে পারছি, পাণ্ডিত্য যাকে বলা হয়, নিতান্তই শুষ্ক জিনিষ। বিজ্ঞানের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের সামান্যতম সম্পর্কও, মানুষের শরীরে যেমন টিউমার থাকে, পণ্ডিতেরাও তেমনি সামাজিক টিউমার। প্রকৃতির গভীর গোপন রহস্য এরা বোঝে না। এরা বিশ্বাস করে ছাপার অক্ষরের প্রমাণ। হায়রে আল্লাহ, আহমদ ছফাকে লোকে ভুল কারণে তারিফ করছে। সে যে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, অনুবাদ, শিশুসাহিত্য এবং সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে, তা অনুদ্‌ঘাটিত থেকে গেলো।

১৪ এপ্রিল, ৮১

নতুন বছরকে অভিনন্দন। এমন করে পয়লা বৈশাখ আমার জীবনে কোনোদিন আসেনি। পুরোপুরি আস্থা এবং আত্মবিশ্বাস সহকারে সামনের দিকে তাকাচ্ছি। একজন নতুন আহমদ ছফা জন্মগ্রহণ করেছে, এখন কাজ পৃথিবীকে সংবাদটা জানানো।

চোখের সামনে একখানা পূর্ণ জীবনের ছবি ভেসে উঠছে। চারদিক পূর্ণতা ছুটে এসে যেনো আলিঙ্গন করছে। সমাজ-সংসার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, জীবন-জীবিকা, স্বপ্ন-সাধনা সবকিছুর সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে আমার। আমার মস্তক আকাশে উঠছে, মূল যাচ্ছে পাতালে।

আগামী পয়লা বৈশাখে যে আহমদ ছফার সঙ্গে মোলাকাত হবে, সে হবে স্ত্রী পুত্রের অধিকারী, যশস্বী, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ইতিহাসের অভিমুখে অভিযাত্রী পুরুষ। চারপাশে মায়া আবরণের ভেতর থেকে আহমদ ছফার সত্যিকার পরিচয় এবার সূর্যের মতো জ্বলে উঠবে।

২রা জুন, ৮২

এখন আবার ফাউস্ট নিয়ে বসেছি।
জীবনের এক চূড়ান্ত অসহায় সময়ে
ফাউস্ট অনুবাদে হাত দিয়েছিলাম।
এখন উদ্দেশ্যের অনেক উপলব্ধি
[illegible] একটি জগৎ ফিরছে
এমনি বাঁচতে চাচ্ছিলাম, যে একটা
প্রত্যেকটি উপাদানের তলায় [illegible]।
ফাউস্ট যে [illegible] [illegible] হয়েছে
সেই সাহিত্যের মধ্যে একটা [illegible]
[illegible] সব সময়েই [illegible]। এটা
[illegible] [illegible] [illegible] আছে।
অনেকটা [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] মতো। [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] নিয়েই [illegible] হয়ে
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]। অন্তত: আমার কাছে এমন
মনে হয়েছে, সাহিত্যস্রষ্টা [illegible]
[illegible] মত সাহিত্য উপলব্ধি-
[illegible] পারে। যদি [illegible] ভাষায় [illegible]
উপভোগ্য করতে। ফাউস্ট অনুবাদে
নিজের হাতে নিয়েছি, [illegible] এবং
[illegible]। এখন যেদিন প্রকাশিত
হবে - আমাদের সাহিত্যে একটি যুগের
[illegible] হবে। সাহিত্যে হাত দিয়ে
[illegible] মন নিয়ে [illegible] [illegible]।
আমার [illegible]।

১ জুন, ৮২

এরই মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। এক বছরেরও অধিককাল জার্নাল স্পর্শ করিনি। গতকাল লিবিয়া যাওয়ার কর্মসূচিটি সরকারি চাপের মুখে বাতিল হলো। মনে হলো স্বস্তি পাওয়া গেলো। ছুটোছুটি করলে যাওয়া যেতো। এ মুহূর্তে আমার দেশে থাকা খুবই প্রয়োজন।

এখন আমি সঙ্গীতশিল্পী, গীতিকার, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, শিশু-সাহিত্যিক, কবি এবং গ্যয়টের অনুবাদক। আমার সৃষ্টিসমূহকে লোকের সামনে তুলে ধরার প্রক্রিয়াটি শুরু করতে হবে।

এক বছরের শিশুর মতো আমি। এ সময়ে একদিনে এক বছরের কাজ করতে হবে। আমার মনে হচ্ছে বাঙালি মুসলমানের ভেতরে থেকে একটি মনীষী পুরুষ আমাকে দিয়ে জন্ম দেয়া সম্ভব হবে। আমার ভেতরের সৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে পৃথিবীর অভিমুখে ধাওয়া করছে।

আমি ফুলের মতো ফুটে উঠতে যাচ্ছি। আমার জন্ম, আমার যুগ, আমার সমাজ, প্রতিবেশ সবকিছুকে অতিক্রম করে আরেকটি দিগন্তে আমার উত্তরণের লীলাখেলা চলছে।

আজ আবার ফাউস্টে ফিরে এসেছি। জীবনের এক চূড়ান্ত অসংলগ্ন সময়ে ফাউস্ট অনুবাদে হাত দিয়েছিলাম। আমার অন্তরের অনুভব উপলব্ধি জানাশোনা একটি প্রগাঢ় বিশ্বাসে জমাট বাঁধতে পারছিলো না, কি একটা প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব ছিলো। ফাউস্ট সে অভাবটা পূরণ করেছে। মহৎ সাহিত্যের মধ্যে একটা পবিত্র প্রাণশক্তি সব সময়েই থাকে। এটা এক ধরনের আশ্চর্য রহস্যময় শক্তি। অনেকটা মা-রেফাত বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মতো। বেশিরভাগ সমালোচক চোকলা নিয়েই নাড়াচাড়া করে, কদাচিত প্রাণশক্তির নাগাল পেয়ে থাকে। অন্তত আমার কাছে এ সত্য স্পষ্ট হয়েছে, সাহিত্যমনা লোকেরা কদাচিত মহৎ সাহিত্য উপলব্ধি করতে পারে। বড়ো জোর তাদের দৌড় উপভোগ পর্যন্ত। ফাউস্ট আমাকে স্থির হতে শিখিয়েছে, শেখাচ্ছে এবং শেখাবে। এ গ্রন্থ যেদিন প্রকাশিত হবে আমাদের সাহিত্যের একটা যুগের আবির্ভাব হবে। গ্যয়টেতে হাত দিলেই শরীর মন নিয়ে মহিলা হাজির হয়। আশ্চর্য যোগাযোগ।

২ জুন ৮২

আজকে ত্রস্ত দিন গেলো। গ্যয়টে আবার আমাকে জীবনে নিক্ষেপ করেছে। গণকণ্ঠে যেয়ে 'বাংলাদেশ : দেশ ও জাতি' এক কিস্তি লেখা হলো। ভূমি সংস্কারের সাক্ষাৎকারসমূহ পুস্তিকা আকারে ছাপবার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। ফিরে এসে জাফরের টাকা পাওয়ার রসিদ পেলাম। খেয়ে ড. এমাজউদ্দিনসহ বাংলাবাজার গেলাম। এমাজউদ্দিন সাহেব পাণ্ডুলিপি জমা দিলেন। টিকিটের বিশ হাজার টাকা কামাল

সাহেবের কাছে জমা দিলাম। ফেরার পথে গণকণ্ঠ। সমকাল। তারপর ৩৪ বঙ্গবন্ধু এ্যাভিন্যু। শাহবাগে যেয়ে একটা পুরোনো ক্যাসেট প্লেয়ার ১০০০ টাকায় কেনা হলো। রফিককে ৫০০ টাকা ধার দেয়া হলো।

৩ জুন, ৮২

আজ দিনটি খুবই থমথমে গেলো। গণকণ্ঠে গেলাম। মুহম্মদের বক্তৃতার পুনর্লিখন করলাম। এটুকুই কাজ। গণকণ্ঠ কাগজখানিকে সত্যিকার শ্রমজীবী জনগণের একখানি দৈনিকে রূপ দিতে পারলে খুব ভালো হয়। সেটা সম্ভব হবে কি? কিসের জন্য ভূতের বেগার খাটছি বলা সম্ভব নয়। এই সরকার শেষ পর্যন্ত দেশকে কোথায় নিয়ে যায় বলা সম্ভব নয়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলে একজনও বিচক্ষণ বুদ্ধিমান এবং নিবেদিত লোক নেই। যারা আছে পরিস্থিতির শিকার। ওখান থেকে ইতিবাচক কোনো রাজনৈতিক তরঙ্গ জাগিয়ে তোলা প্রায় একরকম অসম্ভব। এই শক্তিটা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হওয়ার পূর্বে এরই গর্ভের মধ্যে একটা নতুন শক্তি জন্মাতে হবে। মনে হচ্ছে ইতিহাস কাজটা আমার ঘাড়েই চাপিয়েছে। প্যালেষ্টাইনের কপালে আরো অনেক দুঃখ আছে। আরবদের আরো ভুগতে হবে। সমস্ত আরব বিশ্বে গাদ্দাফিই একমাত্র মানুষ। কিন্তু তাঁর করার ক্ষমতা খুবই সীমিত। আনু এবং সিরাজকে চিঠি লিখেছি। ডাকে দেয়া হয়নি। তৌহীদটা একটা মানুষ নয়। আবদুল্লাহ কোনোদিন বিপ্লবী হতে পারবে না। মোরশেদটা সংকীর্ণ। সে ভীতু বলেই সৎ। অহঙ্কারী বলেই আদর্শবাদী। আসলে সে নিষ্ক্রিয় সুবিধাবাদী। চরিত্রের শক্তির অভাবে নীতিবাগিশ থেকে গেছে।

৬ জুন, ৮২

আবার অনিয়ম হতে শুরু করেছে। সমস্ত কাজ-কর্মগুলো তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কোনো গতি স্ফূরিত হচ্ছে না। এটা বুঝতে পারছি, আমাকে below average মানুষদের মধ্যে বাস করতে হচ্ছে। এটা এমন একটা অসহনীয় পরিস্থিতি, অনেকটা ভারী মোট মাথায় নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার মতো। যদি লোকগুলোকে নিয়ে কিছুদূর ওঠা গেলো তারা বলবে নিজেরাই তারা গৌরবের দাবীদার। ভারে যদি তোমার পা পিছলে কিছু পিছিয়ে যায়, অমনি তারা বলবে এ জন্য তুমি দায়ী।

গতকাল দিনটা গেলো অনিশ্চিতের মতো। যতোই কাজ করতে চেষ্টা করছি, মনে হচ্ছে ততোই গহীন জঙ্গল অভিমুখে যাত্রা করছি। সবকিছু অচেনা, সবাই চ্যালেঞ্জ করার জন্য শিং বাগিয়ে রয়েছে। কে জানে হয়তো একটা সম্মোহনের মধ্যে রয়েছি। জাসদ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করতে হবে। যুব সংগঠনটা করা অসম্ভব নাও হতে পারে। সামাজিক বিজ্ঞান পরিষদকে একটা ভিত্তি দেয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

৭ জুন, ৮২

আজ সকালবেলা শাহেদ আলী সাহেব ঘুম ভাঙালেন। তাঁকেসহ ডঃ ইমাজউদ্দিনের বাড়ি। ইসলামিক রিসার্চ কাউন্সিল, জে.এস.ডি.-র সঙ্গে বৈঠক, এসব ব্যাপারে ভাসাভাসা কথা হলো। মুহম্মদউল্লাহ্ হাফেজ্জী হুজুরের কাছে গেলাম। এটা একটা অভিজ্ঞতা। তাঁকে সকলেই কামেল মনে করেন। আমিও তাই মনে করি। দূরদর্শী এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ তিনি। তাঁর চারপাশে যাঁরা আছেন, তাঁদের বেশিরভাগ ঠিক যোগ্য লোক নন। কিন্তু অন্যান্য ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক দলের লোকের সঙ্গে তাঁদের একটা পার্থক্য আছে। সেটা হলো তাঁদের পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব সম্পর্কে অস্পষ্ট হলেও একটা ধারণা আছে। সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীদের ভেতর তা মেলে না, আদর্শ সংঘবদ্ধ প্রতিটি গ্রুপের অবস্থা যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞান এবং দেশপ্রেম তাঁদের মধ্যে উপস্থিত নেই। কোনো রাজনৈতিক দল চেষ্টা করলে এঁদের ভালোত্বকে সমূহপরিবর্তনের কাজে ব্যবহার করতে পারে। ইসলামের সম্ভাবনা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগহীন কোনো রাজনীতির ভবিষ্যত এদেশে নেই।

৮ জুন, ৮২

যেভাবে ইচ্ছে করি লেখা হয় না। লেখার সঙ্গে প্রকৃত বাস্তবতার অনেক পার্থক্য। অনেক ক্ষেত্রে লেখা বাস্তবতা ফুটিয়ে না তুলে বিকৃতভাবে প্রকাশ করে। মানুষ যে সমস্ত কথা বলে, ইতিহাসের কাছে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য সজ্ঞানভাবে লিখে যায়, ওসমস্ত প্রয়াসের মধ্যে একটা কপটতা রয়েছে। মানুষ কি কপটতা একেবারে ছেড়ে দিতে পারে? এটা একটা প্রশ্ন বটে। যৌনক্ষুধা এক মারাত্মক জিনিষ। অসম্ভব চাপ অনুভব করছি। অথচ আত্মাভিমান এতোদূর বেড়ে গেছে যে, একটু চেষ্টা করে দেখার কোনো তাগিদই অনুভব করছি না।

আমি অনুভব করছি, সমস্ত পরিবেশটা ফাটিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটাবার সময় এসে গেছে। অস্তিত্বের ভেতরে প্রচণ্ড একটা অস্থিরতা। একটা ইতিহাসের বেদনা আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। গন্তব্য আমাকে কোথায় টেনে নেবে বলতে পারিনে। আমার জন্য ফাঁসীকাঠ না রাজকীয় সম্মান অপেক্ষা করছে, আল্লাহ্ জানেন।

JANUARY 1981 Saturday 10

26 Poush 1387 3 Rabi-ul-Awwal 1401

দুপুর ১২ : আজ [illegible] [illegible]
সাথে খুব তর্কাতর্কি হল। তাঁকে সহ ড. এমাজউদ্দিনের
বাড়ী। [illegible] [illegible] [illegible], দই, [illegible]
সাথে) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
হলাম। মুহম্মদউল্লাহ্ [illegible] [illegible] [illegible]
বাহক। এটাই একটা অভিজ্ঞতা। তাঁর সামনে
[illegible] [illegible] [illegible]। আমি এটাই মনে করি।
মুসলমান এবং অমুসলিম সম্বন্ধে [illegible] [illegible],
তবুও [illegible] [illegible] আছেন, তাঁদের
কোনো [illegible] [illegible] [illegible] নেই। কিন্তু
অন্যান্য জামাত এবং সাম্প্রদায়িক দলের লোকের
সাথে তাঁদের একটা সম্পর্ক আছে। সেই
হেতু তাঁদের [illegible] [illegible] সম্পর্কে
অস্পষ্ট [illegible] একটা [illegible] আছে।
[illegible] সাম্প্রদায়িক [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু
[illegible] এবং [illegible] তাঁদের মধ্যে
উপস্থিত নেই। যেসব রাজনৈতিক দল
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
সাথে [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] নেই।

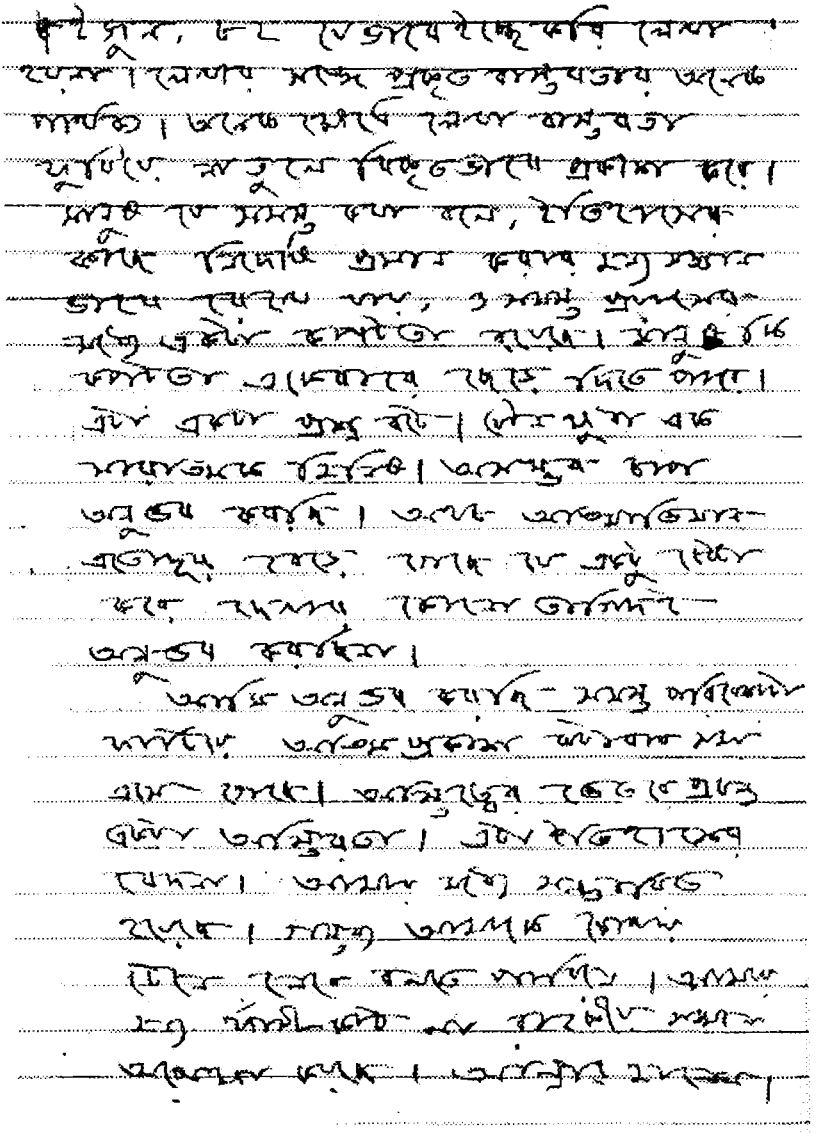

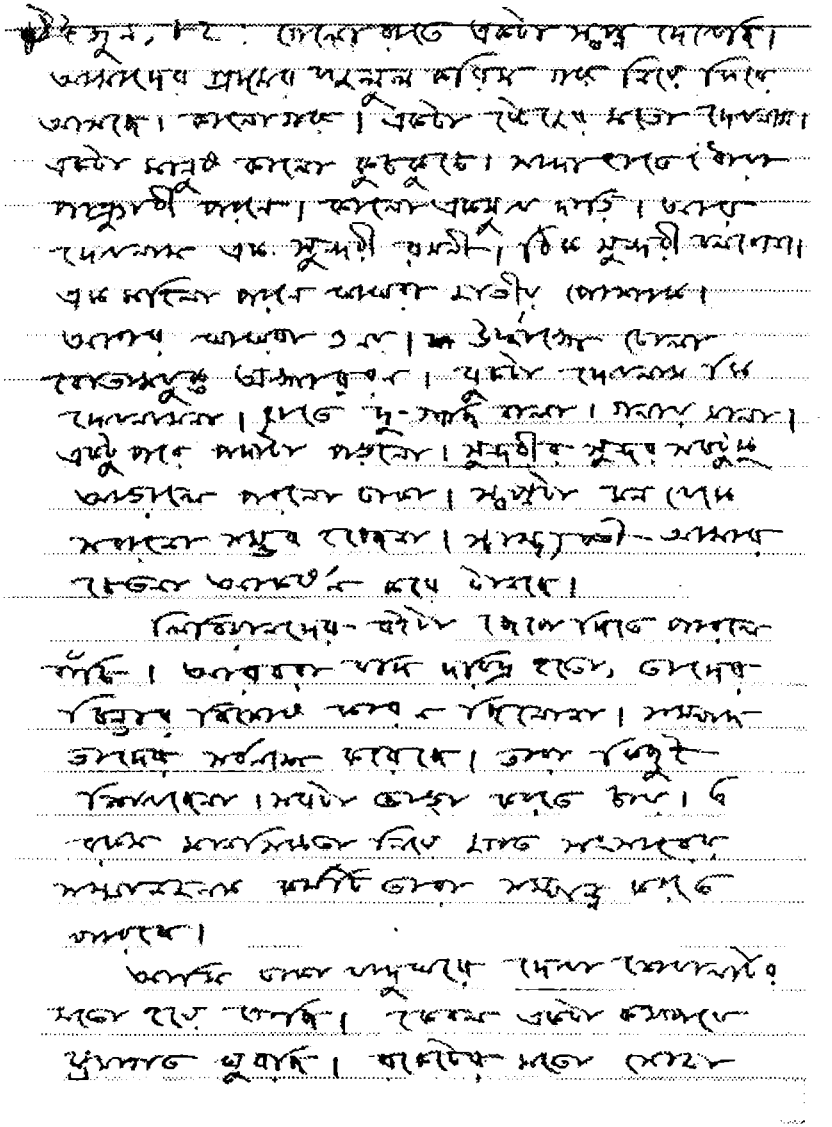

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

৯ জুন, ৮২

গেলো রাতে একাট স্বপ্ন দেখেছি। আমাদের গ্রামের ফজলুল করিম গরু নিয়ে ফিরে আসছে। কালো গরু। একটা স্টেজের মতো দেখলাম। একটা মানুষ কালো কুচকুচে। সাদা ধোয়া পাঞ্জাবি পরনে। কালো একমুখ দাড়ি। আর দেখলাম এক সুন্দরী রমণী। ঠিক সুন্দরী বলবো না। এক মহিলা, পরনে ঘাঘরা জাতীয় পোশাক। আবার ঘাঘরাও নয়। উর্ধ্বাঙ্গে ঢোলা বোতামযুক্ত অঙ্গাবরণ। বুকটা দেখলাম কি দেখলাম না। হাতে দু-গাছি বালা। গলায় মালা। একটু পরে পর্দাটা পড়লো। সুন্দরীর সুন্দর সবটুকু আড়ালে পড়লো ঢাকা। স্বপ্নটা মন থেকে সরানো সম্ভব হচ্ছে না। স্বাস্থ্যবতী আমার চেতনা আকর্ষণ করে টানছে।

লিবিয়ানদের বইটা ছেপে দিতে পারলে বাঁচি। আরবরা যদি দরিদ্র হতো তাদের চিন্তার বিশেষ কারণ ছিলো না। সম্পদ তাদের সর্বনাশ করেছে। তারা কিছুই শিখছে না। সবটা ভাড়া করতে চায়। এ রকম মানসিকতা দিয়ে জগত-সংসারের সম্মানজনক কর্মটি তারা সম্পন্ন করতে পারবে?

আমি ঢাকা জাদুঘরে দেখা শেয়ালটির মতো হয়ে গেছি। কেবল একটা কক্ষপথে ক্রমাগত ঘুরছি। রকেটের মতো সোজা ওপর দিকে যেতে পারছিনে। মাঝে মাঝে মনে হয়, এ বন্ধনের ভেতরে ভেতরে একটা মুক্তির সুড়ঙ্গ কাটা হয়ে যাচ্ছে। ফাউস্ট ছাপার সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। কণ্ঠে সঙ্গীত-স্বরস্বতীও বাসা বাঁধছেন। ভাইপো-ভাগ্নেদের মধ্যে একটা দিগন্ত আসতে শুরু করেছে। যেগুলোকে আমি বন্ধন মনে করেছি সেগুলোর মধ্যেই মুক্তির ঈশারা ঝলকাতে লেগেছে।

আমার সাধনা আমাকে ঊর্ধ্বদিকে টেনে তুলছে। আমার এতো কষ্ট ভোগ তার কি কোনো সার্থকতা নেই? মাথায় খুস্কি, চোখের নিচে কালো দাগ এবং দাঁতের ব্যথা এ তিনটি যেনো আমি সাহিত্য, সঙ্গীত এবং রাজনীতির কাছ থেকে পেয়েছি।

আল্লাহুতায়ালাকে ধন্যবাদ। আমি যার উপযুক্ত যোগ্য করে নিচ্ছে। খুব দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে, আমার আর প্রেমে পড়া হলো না।

১০ জুন, ৮২

আমি একজন ভূমিহীন বৃদ্ধ চাষির জবানীতে একটা উপন্যাস লিখবো। আরেকটা উপন্যাস লিখবো তরুকে নিয়ে। ভ্রান্ত জীবনাদর্শ এই মেয়েটিকে অকালে হত্যা করেছে। সেই ভ্রান্ত আদর্শের অনুসারী, বাংলাদেশের ইতিহাসে তাদের নেতিবাচক ভূমিকার কথা আমাকে লিখতেই হবে।

আন্তরিকতা না থাকলে কোনো কাজ হয় না। কথাটা ভিন্নভাবে বলা উচিত। আন্তরিকতা না থাকলে কোনো মতে কাজ হয় না। আন্তরিকতা একটা শক্তি। তাকে ধারণ করার মতো, সংবহন করার মতো বাইরে একটা শক্ত কিছুর আশ্রয় প্রয়োজন; নয়তো আন্তরিক মানুষদের জীবন অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হয়, যেখানে শক্তি এবং জবরদস্তি প্রয়োজন না করাটাই অন্যায়।

আমি এখনো আকাশে মূল ছড়াচ্ছি। মাটিতে শেকড় গাড়তে পারিনি। সত্যিকারভাবে ইতিহাসে প্রভাব বিস্তারের অর্থে যদি ধরা হয়, আমার সমসাময়িক অনেকের চাইতেই সঠিক পথে আমি অগ্রসর হচ্ছি। যদি মামুলিভাবে জীবনের সফলতা ব্যর্থতা দিয়ে বিচার করা হয় তাহলে আমার জীবন ব্যর্থ বলেও মনে হতে পারে।

১১ জুন, ৮২

আজকের দিনটা কেমন গেলো বলতে পারবো না। এখন এমন এক সময় যাচ্ছে তার তাৎপর্য বাইরে কেউ অনুধাবন করতে পারছে না। আমি অনুভব করছি, আমার ভেতর একটা আশ্চর্য শক্তির উত্থান। খণ্ড খণ্ড ভাবে যদি দেখি অদৃশ্য থেকে যাবে। সবটা মিলিয়ে দেখলেই তবে পূর্ণচিত্র হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু তলিয়ে বিচার করে দেখতে পাচ্ছি এতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। ঐতিহাসিক শক্তির মাধ্যম হিসেবে আমি কাজ করে যাচ্ছি। ভাঙা সেতুর মতো টুকরো টুকরো কাজ। একটা পদ্ধতির বাঁধনে এখনো আটকা পড়েনি। অন্তর্গত সুরসঙ্গতির বেগ এখনো চালিয়ে নিচ্ছে না। এটা পূর্ণতা লাভ করতে ইতিহাসের অস্পষ্টতা এবং জটিলতা কাটার প্রয়োজন।

আমার আরব্ধ কাজগুলো ঠিক ঠিক খাতে প্রবাহিত হলে এদেশে একটা নবযুগের সূচনা হবে। মাটি কোপানো, জল দেওয়া এবং বীজ লাগানো চলছে। আজ 'বাংলাদেশ' দেশ ও জাতি'র তৃতীয় কিস্তি লেখা হলো। লিবিয়ানরা কথার খেলাপ করলো। সমকালের ভবিষ্যত পরিকল্পনা করা হলো।

সাইপ্রাস ৮.২ । আমাদের দ্বিতীয় দেশে যেতে
কয়েক ঘণ্টা লাগবে। এখন এমন এক সময় যাচ্ছে
[illegible] বাইরে [illegible] অনুভব করতে
পারছি না। আমি অনুভব করছি, আমার ভেতর
একটা আশ্চর্য সাধুর উপাদান। মন্দ মন্দ ভাবে
যদি যাই, অন্য সব দেখে যাব। সবটা মিলিয়ে
দেখানো তাও [illegible] হয়ত পাওয়া যাবে।
কিন্তু ওদিকে বিমান থেকে দেখতে পাচ্ছি
তবে আমার চোখের তৃপ্তি নেই। ভূমধ্যসাগর
সম্পূর্ণ সাঁতার হিসেবে আমি পার হয়ে
যাচ্ছি। ওপর থেকে মনে হচ্ছে ঢেউয়ের ঢেউয়ের
খেলা। একটা সমুদ্রের [illegible] এখানে
আলোকপাত [illegible]। [illegible]
[illegible] চাদিকে [illegible]। [illegible]
[illegible]
এবং [illegible]
[illegible]
[illegible] একটা [illegible]
[illegible] হবে। [illegible]
[illegible] এবং
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
হবে।

~~বই টুন, আমি এখনো কিছু উপন্যাস লিখতে।~~
নয় [illegible] আবেগ [illegible] ও [illegible] স্ফূর্তি।
দুজে ঘটনার ~~[illegible]~~ বিশ্বাস নিয়ে গ্রীষ্ম মুসল-
মান মেয়ের হাতীতে সমস্ত সামাজিক সম্পর্কে
ঐতিহাসিক ভাবে ও নেমেছে হলো এবং একটি
[illegible] অনেক কাহিনী মুসলমান পরিবারের
এবং আবেগ একটি। অন্তত: এ ব্যাপারে
ভাবিতে হবে।

আজ মিনহু এবং আবুকে চিঠি লিখলাম।
তাদের সামনে নতুন একটি দিগন্ত খুলে দিতে
চেষ্টা করলাম। মিনহু লোক ভাল এবং
প্রবৃত্তি-মুখ হয়েছে। ভবিষ্যৎ অন্ধকার।
বাংলাদেশের সংবাদপত্রের [illegible] ব্যক্তি সাংবাদি-
কের চাকুরি হারালো। [illegible]
[illegible] ৬০ টাকা নিতে পারে। [illegible]
২০ টাকা। বাংলাদেশ [illegible] ২৫ লক্ষ টাকা।
আমি আগামী [illegible] হবে ভাবনাম। বন্ধু
[illegible] অনেক ভালো। [illegible]
[illegible] দেখতে পাইনি শেষে। কি জানি তবে।
মানুষ [illegible] এবং [illegible] সঙ্গে [illegible]
হলো। শুধু [illegible] এবং মানুষের প্রতি [illegible]
[illegible] হলে আর [illegible]
[illegible]
[illegible] আমি [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

১২ জুন, ৮২

আমি একটা ছোট্ট উপন্যাস লিখবো, নাম রাখবো 'ছহি বড় পরীবানুর পুঁথি'। ওতে একটা নিরক্ষরা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান মেয়ের জবানীতে সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের জটাজালটা আমি উন্মোচন করবো এবং ব্যবহার করবো বাঙালি মুসলমান পরিবারের একান্ত ঘরোয়া ভাষা—অন্তত সে আবহটা ফুটিয়ে তুলবো।

আজ সিরাজ এবং আনুকে চিঠি লিখলাম। তাদের সামনে নতুন একটা দিগন্ত তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম। ছেলেগুলোকে নিয়ে আমার কর্মসূচি শুরু হয়েছে। বাদবাকি আল্লাহ ভরসা। গণকণ্ঠের সাংবাদিকদের কাছে একটা সাহসী ভাবনা ছড়িয়ে দিলাম। জার্মান দূতাবাসের সাধন ৩০০ টাকা নিয়ে গেলো। সাঈদ ২০ টাকা। রাগিবকে পোট্রেটের জন্য ১০০ টাকা। আমি জানি, ভুগতে হবে আমাকে। কিন্তু নিজেকে স্থির রাখতে পারছিনে। গোটা ইতিহাসটা ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে। নিউ মার্কেটে গেলাম। মান্নান সৈয়দ এবং আল মাহমুদের সঙ্গে দেখা হলো। শুধু সাহস এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কারণে দু'জনে আজ ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল। সৎসাহিত্য সৃজনের স্তরে মান্নানের চেতনার উত্তরণ ঘটবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি সঙ্গীতে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছি, ভবিষ্যতে কি ঘটবে জানিনে। আপাতত একটা সামাজিক বিপ্লবের পরিকল্পনা নেই। যা হবার হবে।

১৩ জুন, ৮২

টাকা জলের মতো খরচ হচ্ছে। কিন্তু আমার বাস্তবতার বোধকে তা অতিক্রম করে যাবে না আশা করি। আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। মানুষও আমাকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করছে। একটা আকাজ করলাম। শরীফ সাহেবকে জানিয়ে দেয়া গেলো, প্রতিটি কাজের সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তিনি আমার শিক্ষক, তথাপি তাঁর মুখোমুখি তিনবার এমনভাবে সিগারেট টানলাম যেনো তাঁকে আমি চিনিনে।

একটা নারীর প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করছি। কিন্তু পরিচিতাদের কারো কাছে যেতে পারছিনে। এরই মধ্যে আমার ভেতরে কি একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন আমি একটু স্থিতি চাই। অনেক কাজ আমাকে করতে হবে। ধাত্রী যেমন করে পেটের বাচ্চাকে বের করে আনে, তেমনি করে বাংলার অবরুদ্ধ ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে।

সুন্দর আমার কাছে ধরা দিতে আরম্ভ করেছেন। আমি নিজের ভেতরে আল্লার অস্তিত্ব উপলব্ধি করছি। আমার এই উপলব্ধিটাই আমার সম্বল। ওদিয়ে আমাকে বাঁচতে হবে। রাজ্জাক স্যারের সাক্ষাৎকার নিয়ে একটা বই বানাতে হবে।

[illegible], [illegible] [illegible] লোকের মত কথা বলছেন। কিন্তু
আমাকে [illegible] [illegible] অতিথি হয়ে
থাকতে [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]
রয়েছে। সম্প্রতি আমাকে [illegible] দিয়ে গ্রন্থ [illegible]
এটার অনুবাদ করলাম। অধ্যাপক সাহেব [illegible],
দেখা হলো। [illegible] [illegible] সম্পাদনা
প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তিনি আমার শিক্ষক, তার
তাঁর মুখোমুখি হতে হয় [illegible] [illegible]
[illegible], গেলে [illegible] আমি [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
কাগজপত্রে। এরই মধ্যে আমার লেখা [illegible]
পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন আমি একটু [illegible]
চাই। অনেক দূর আমাকে যেতে হবে।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
এলাম [illegible]।

হুমায়ুন আমার কাছে [illegible] দিয়ে [illegible]
[illegible]। আমি নিজে [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] এই
উপন্যাসটি [illegible] [illegible]। [illegible]
আমাকে যেতে হবে। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] নিয়ে [illegible] [illegible] [illegible]।

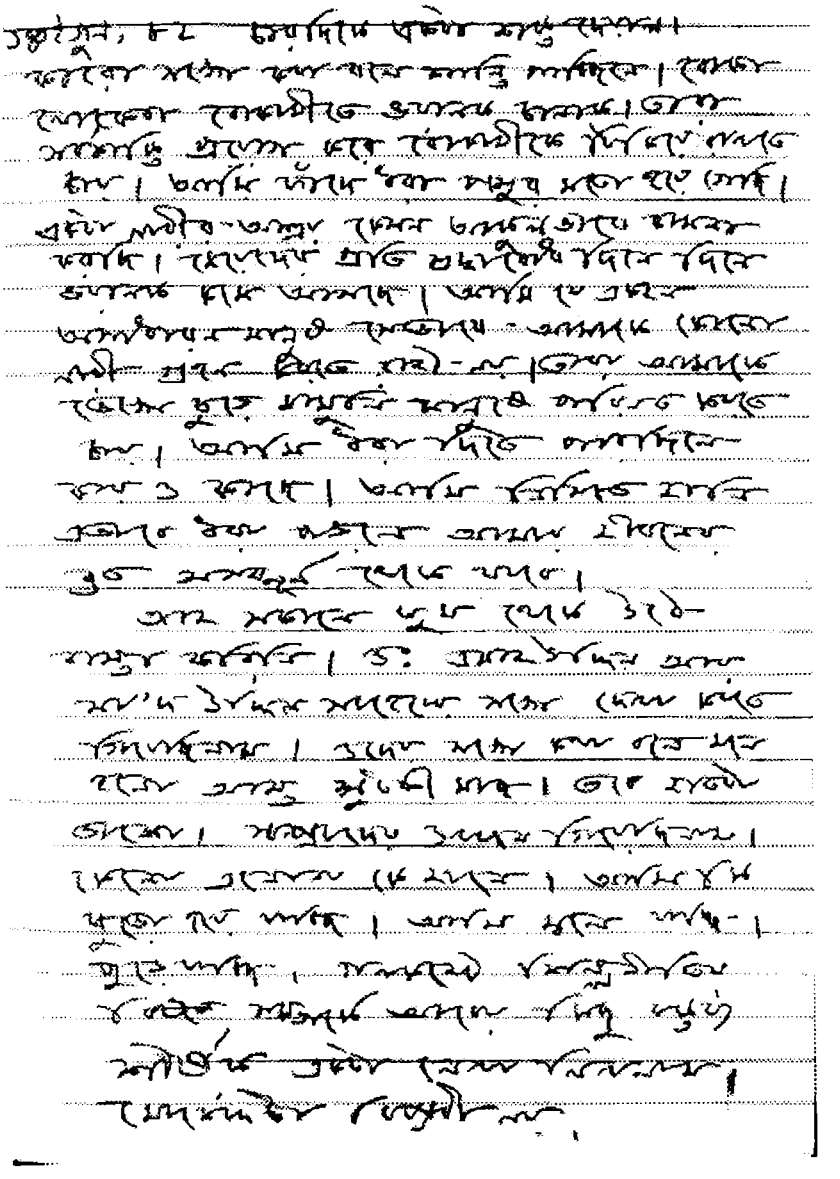

JANUARY 1981 Tuesday 20

6 Magh 1387 13 Rabi-ul-Awwal 1401

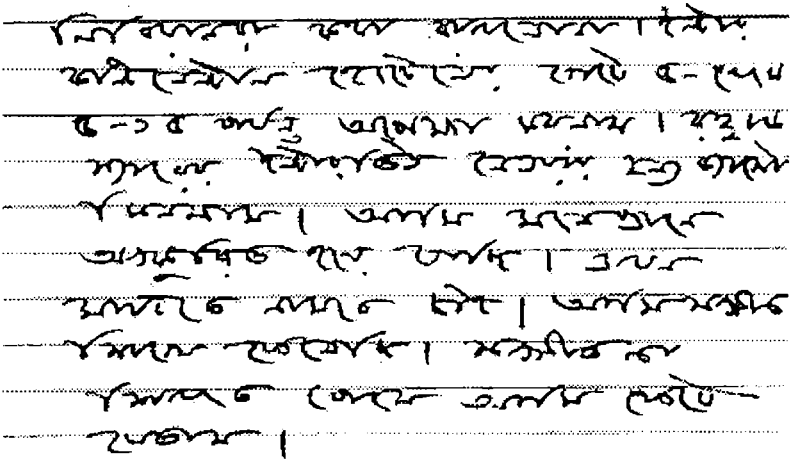

১৪ জুন, ৮২

চারদিকে একটা শক্ত দেয়াল। কারো সঙ্গে কথা বলে শান্তি পাচ্ছিনে। বোকা লোকেরা বোকামীতে ভয়ানক চালাক। তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বোকামীকে টিকিয়ে রাখতে চায়। আমি ফাঁদে ধরা পশুর মতো হয়ে গেছি। একটা নারীর আশ্রয় কেমন আকুলভাবে কামনা করছি। মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দিনে দিনে ভয়ানক কমে আসছে। আমি যে একজন অসাধারণ মানুষ সেভাবে আমাকে নারী গ্রহণ করতে রাজী নয়। তারা আমাকে ভেঙ্গে-চুরে মামুলি মানুষে পরিণত করতে চায়। আমি ধরা দিতে পারছিনে কারও কাছে। আমি নিশ্চিত জানি, এভাবে ধরা পড়লে আমার জীবনের ব্রত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করিনি। ডঃ এমাজউদ্দিন আর সা'দ উদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ওদের সঙ্গে কথা বলে মনে হলো আস্ত শুটকি মাছ। তবে জাতটা ভালো। স্বপ্নাদের ওখানে গিয়েছিলাম। কেনো এলো না কে জানে। আমি কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি? আমি জ্বলে যাচ্ছি, পুড়ে যাচ্ছি। গণকণ্ঠে শিল্পনীতি সম্পর্কে আরো কিছু বক্তব্য শীর্ষক একটা লেখা লিখলাম। মোরশেদটা বিপ্লবী নয়।

লিবিয়ানরা কথা রাখলো না। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের গেটে ৫ থেকে ১৫ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। রাজ্জাক স্যারের ইন্টারভিউ নেয়ার জন্য ক্যাসেট কিনলাম। আমি মনে-প্রাণে অঙ্কুরিত হয়ে গেছি। এখন মাটিতে নামতে চাই। আমি সঙ্গীত শিখে ফেলেছি। সঙ্গীত না শিখতে পেলে আমি ফেটে যেতাম।

হয়েছেন, চট, আমার মনে হচ্ছে মহৎ জীবনের দিকে
অগ্রসর হচ্ছি। আমি মনে মনে জীবন গ্রহণ
করে আছি। কর্মসমূহ সম্পূর্ণ হবে সম্ভবত
হয়ে উঠছে। আমার সব কাজের শুরু আছে, শেষ
নেই। ভেতরে বাইরে আমি দু'হাতে লড়ছি।
আর মনের মতো হয়ে আমার কাজ নেই।
ড. আহমদ শরীফের আমি দুটো দিতে থাকব
ভেবেছি। সামনে কি হবে কি জানি। কখন
কাকে ভালোবাসব কে কি জানে।
আমি এ জীবনে কি যে পাব কিছুই
জানি না, কাকে এখন তোর জন্য আমার
সময় হবে, কিছুই, কখন কোথায় কে
মন দেবে কে জানে। আসলে দেখে
হচ্ছে মানব সভ্যতা থেমে গেছে। অনুভব,
মানব সমাজে অভিজ্ঞতার অনেক কিছু
অনুভবের এক অন্তর্গত অনেক কিছু
এসে গেছে। তবু মনে আমার এক
নতুন স্বপ্ন উঠছে উদার আকাশের
মতো সকল উচ্চ শিখরগুলো
এবং সমুদ্র সমান এক উচ্চতা।
কবিতা লিখি কি না এখনো জানি
আমার লাগছে না। আর কিছুতেই
না লিখলে; আমি না লিখে
পারব না। আমার কেবল কিছুই

নেই খবর। অনেকক্ষণ মন খারাপ হেনুর
আকমল বিয়ের কার্ড দিয়ে গেছে। সুলতানকে
তাদের জেনেছি, ছেলেদের দাবি, ওরা
আমার ও বিয়ের দিন ঠিক। এদের
বিয়েতে যাব। তবে যাই আমি, তবে
খুব ভাল হবে যে দেশ।

সুলতান সম্পর্কে ইত্তেফাকে রিপোর্ট
ছাপা শুরু হয়েছে। শুধু বিশেষ কথা
লিখেছেন। যদি হয় সময়, তবুও
এ প্রসঙ্গে অনেক কিছু বলার থাকবে
থেকে যাবে।

আমার সম্পাদকীয় মাত্র আজকের
ছাপা হয়েছে। মাত্র দুটি প্রকাশিত। তা
না হলে আমার চিন্তা সুসংহত
এবং সুসম্পাদিত হবে।

১৫ জুন, ৮২

আমার মনে হচ্ছে মহৎ জীবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। তথাপি মনে মনে ভীষণ গ্লানি জমে আছে। চারপাশের মানুষজনের সঙ্গ অসহ্য হয়ে উঠছে। আমার সব কাজের শুরু আছে, শেষ নেই। ভেতরে-বাইরে আমি দু'জন হয়ে গেছি। অন্যজনের মতো হওয়া আমার কপালে নেই। ডঃ আহমদ শরীফকে আমি জবাব দিতে আরম্ভ করেছি। পরিণতি কি হবে কি জানি। কখন, কাকে তোয়াক্কা করে কি করেছি? আমি এ জাতিকে নিয়ে যে ধরনের চিন্তা করছি একজনও তা করে না। আমার সমস্ত কাজ, চিন্তা, কথা-বার্তা সে মাপ এবং সে আকারের। আমাকে যেতে হচ্ছে বনের মধ্যে পথ কেটে। অন্ধকার, কখনো-সখনো ঘন বনের অন্তরালে এক-আধটা আলোর রেখা এসে লাগে। তবু মনে ভরসা আছে, এক সময় উদার আকাশ করুণায় মাথার ওপর নেমে আসবে এবং সমুদ্র সামনে এসে দাঁড়াবে। অন্তরে অন্তরে কি সংগ্রামই-না আমাকে করতে হচ্ছে। আজ দিনটা নষ্ট করলাম। আমি নষ্ট মনে করছি। আসলে কোনো কিছুই নষ্ট হয় না। একটি বেলুন আকাশে বিহার করার পূর্বে সুতোতে আটকা অবস্থায় যেভাবে থাকে, আমার অবস্থাও হয়েছে সে রকম। এ সুতো ছিঁড়লেই বাঁচি। কতো কষ্ট আছে, কতো যুদ্ধ করতে হবে কে জানে।

রাজ্জাক স্যারের ইন্টারভ্যু নেয়ার কাজটি পণ্ড হলো। ভদ্রলোক বাসায় ছিলেন না। যদি মরে যান ভদ্রলোক এ জাতিকে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত রেখে যাবেন।

আমার সবদিকে শক্ত অবলম্বন প্রয়োজন। শক্ত কিন্তু প্রসারিত। তা না'হলে আমার বিকাশ সুগঠিত এবং সুবলিত হবে না।

১৭ জুন, ৮২

আমার একমাত্র লক্ষ্য স্থিত হওয়া। এই মাটিতে শেকড় প্রসার করে আকাশে মাথা তোলার সময় আমার এসেছে। আকাশের ছায়া পথের মতো শুধু কাজের খাতগুলো দেখতে পাচ্ছি। এই সময়টা আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গীতটা কণ্ঠে উঠি উঠি করছে। যদি একটা আকার দিয়ে ফেলতে পারি তাহলে আমার পূর্ববর্তী তিন জেনারেশনের ফাঁকটা পূরণ করলাম বলতে হবে।

আজ লিবিয়ান পিপল্‌স ব্যুরোতে গেলাম। আমার ধৈর্য দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। দুপুরে শুনলাম একটা মানুষের মৃত্যু সংবাদ। আলম সাহেবের চাচা। হাসপাতালে অপারেশান করতে যেয়ে মারা গেছে। তাঁর পরিবার-পরিজনের সে কি কান্না! আমার যে কেমন লেগেছিলো! বুকের মধ্যে যেনো একটা নদী গর্জাচ্ছিলো। জীবনে শোকের প্রয়োজন আছে। বাড়িটাতে মহাভারতের শান্তিপর্বের মতো শান্তি। মিটসেফ, মাদুর এবং বাঁশি কিনলাম। আনুকে আসতে লিখে দিয়েছি।

আমি আকাশের ওপর দিয়ে হাঁটছি। মাটিতে নামার প্রয়োজন আছে। পথ পাচ্ছিনে।

১৮ জুন, ১৯৮২

আজ মোরশেদ শফিউল হাসানের 'রোকেয়া : সময় ও সাহিত্য' প্রকাশিত হলো। অনেক দিনের চেষ্টার পর জমাট রূপ। আমি পাতালের দিকে যেমন যাচ্ছি, আকাশের দিকেও উঠছি। আজকে কাজ বিশেষ হয়নি। তথাপি জমাটি দিন। সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি। সকালে গণকণ্ঠে গিয়েছিলাম। মোরশেদের বইয়ের জন্য একটুখানি আলোড়িত হয়েছিলাম। তাই লেখাটা খারাপ হয়ে গেলো। আমার চোখের কোণার দাগ যেনো যাবে না।

এই বৃষ্টিতে বড়ো একা। সমস্ত চরাচরে একা আমিই জেগে আছি যেনো। একটা বউ থাকলে ভালো হতো মনে হয় না। সমস্ত শক্তিটা আমি সঙ্গীতের পেছনে দিতে পারছি। একটা মেয়ে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে হয়তো এরকমভাবে আত্মানুসন্ধানটা সম্ভব হতো না। কতো নিচু থেকে উঠে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাল্লা দেবার দুঃসাহস পোষণ করছি। পরিবারটাকে তুলে আনবো। একটা বিয়ে করবো। স্থিতিশীল হতে চাচ্ছি।

১৯ জুন, ৮২

আজ সকালে রোজীদের বাসায় যেতে হয়েছিলো। সম্পর্কটা কি এখনো শেষ হয়ে যায়নি? বেবীকে রফিককে দেয়ার জন্য একশো টাকা দিলাম। সামাজিক বিজ্ঞান পরিষদটা এবার বোধহয় গঠিত হবে। আগামী বিষ্যুদবার মোরশেদের বইয়ের প্রকাশ উৎসব। কেমন হবে কে জানে। তারপর রাগিবের ওখানে। রাগিব নেই। পাইওনিয়ারে জনাব মোহাইমেনের কাছে যেয়ে লিবিয়ানদের বইটার ভুলের একটা সুরাহা করা গেলো। তারপর গণকণ্ঠ, কাজ কিছু হলো না। শাজাহান সিরাজের সঙ্গে দেখা। আমি কিসে জড়িয়ে যাচ্ছি নিজে জানিনে। অনেক সময় নষ্ট করে বাংলাবাজার। ভুলে গেছি। ছাতিটার মধ্যে ছেঁড়া আবিস্কৃত হলো। বাথরুমের কমোডের ট্যাঙ্কটা অকেঁজো হয়ে গেছে। গেলো দু'বছর নিজে নিজে মেরামত করে আসছি। এবার মিস্ত্রী ডাকতে হবে। সে এক ঝামেলা। গত দু'দিন ধরে আত্মহনন করেছি। জীবনে বাঁচার আনন্দ নেই। বিয়ে-শাদী করিনি সে জন্যও প্রাণে দুঃখ নেই। আমি সহজ এবং গোলমেলে মানুষ। ঢাকা শহরের ব্যাপ্তি এবং গভীরতা এ অল্পসময়ের মধ্যে কতোদূর বেড়ে গেছে। কিন্তু এই নগরীর প্রতিনিধিত্বের দাবিদার মানুষেরা এখন পর্যন্ত উপজাতীয় সর্দারের মতো থেকে গেছে।

২০ জুন, ৮২

যে কাজ আমার ওপর নেমে আসছে আমি কি তার যোগ্য? ব্যক্তির যোগ্যতা বলে কিছু কি আছে? ইতিহাসের ধারণাই মানুষকে ঐতিহাসিক কর্মসাধনে প্রাণিত করে। আজকে হঠাৎ করে অনুভব করছি। ব্যক্তিত্ব কিংবা বীরের আলাদা কোনো মূল্য নেই।

এখন আমার ধারণা হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতি এবং শিল্প-সাহিত্যের কতিপয় ক্ষেত্রে আমার যে বোধ, উপলব্ধি তার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। অতএব ছুটোছুটি না করে স্থির হয়ে বসে থাকলেই আমার কর্তব্যটা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারবো। আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে, রাজনীতিটাকে এমন একটা দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব যা আগে কেউ চিন্তাও করতে পারেনি। প্রচণ্ড একটা অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। বাঁধনহীন মানুষের অনেক বাঁধন।

২১ জুন, ৮২

আমি অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যেখানে আমার পারিবারিক স্থিতি এবং যেখানে পৌঁছাতে চাইছি দূরত্ব এতো অধিক এবং মধ্যবর্তী স্তরসমূহ এতো তাড়াতাড়ি অতিক্রম করতে হচ্ছে কোথাও স্থিত হতে পারছিনে। সাধারণ মানুষের সংগ্রাম, পারিবারিক দায়িত্ববোধ এবং নিরলস সৌন্দর্যসাধনা আমাকে শরীর মনে বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে ভেঙে-চুরে ছত্রখান হয়ে যেতাম। নিজের আগুনে নিজেই পুড়ে যেতাম। আমার মধ্যে একটা Prophetic Property আছে। সেটিকেই পরিচর্যা করতে হবে। রাশি রাশি বস্তু ছেঁকে ছেনে পরীক্ষা করে দেখা আমার কর্ম নয়। আমি তো অতি অনায়াসেই বস্তুর অন্তর্বর্তী জটসমূহ দেখতে পাই। জন্মান্ধ দৃষ্টিহারা মানুষদের সঙ্গে বচসা করে নিজের উপলব্ধিকে আবিল করতে চাইনে। আমি পৃথিবীকে অতো তোয়াজ করতে পারবো না। আমার আকাঙ্ক্ষা অনুসারে পৃথিবীকে পাল্টাতে হবে। শেষ পর্যন্ত Non resistance-ই Best resistance. কিন্তু তার জন্য মানুষকে নিজের ওপর অগাধ এবং অপরিমেয় নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে হয়।

২৯ জুন, ৮২

মাঝখানে ক'দিন লিখিনি। গত সাতাশ তারিখ মুহম্মদ নুরুল আনোয়ারসহ সিরাজ এসেছে। মনে হলো শেকড়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। কল্পনা করে আনন্দ, তাই কল্পনা করছি। ওরা আমাকে রস দেবে, আমি দেবো আলো। দেখা যাক, আল্লাহ্ কি করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্ধকার প্রকোষ্ট আলোকিত করে তুলতে হচ্ছে।

জীবনের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েছি। জনতা টাকা চেয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকে একজনের ১৫,০০০ হাজার টাকার কো-গ্যারান্টার হয়েছিলাম। ধরে যদি জেলে পুরে, কিচ্ছু করার নেই। গ্যয়টে শেষ হবো হবো করছে। গান হয়েছে, কিন্তু কেউ জানে না। গণকণ্ঠ বন্ধ হয়ে যাবে কি মাঝখানে? মোহাইমেন সাহেবের কাছে বিশ হাজার টাকার জিম্মা রইলাম। শিরিন কেনো একথা বললো। জলিল সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক কি দাঁড়াবে? চোখ-কান বুজে আল্লাহ্র ওপর ছেড়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ যাই করেন, বান্দা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়া ছাড়া কি করতে পারে। আমিন।